Cooch

পালিতা হইয়াছিল। সেখানে সে নির্ব্বাদে শুধু সংসারের কাজই করিয়া যাইত, সকলেরই অত্যাচার পীড়ন সহ্য করিত। নিজের সত্ত্বা পর্য্যন্ত তাহার ধারণায় জাগে নাই।

বিশ্বপতির মা হঠাৎ একদিন এই মেয়েটীকেই পছন্দ করিয়া ফেলিলেন। কি দেখিয়া যে তাঁহার পছন্দ হইল তাহা তিনিই জানেন। তিনি বিবাহের সমস্ত খরচপত্র দিয়া মেয়েটীকে নিজের ঘরে আনিলেন।

বিশ্বপতি প্রথম দুই একবার আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু তাহার সে আপত্তি টিঁকে নাই। মা তাহার কোন কথা শুনেন নাই,—জোর করিয়াই বলিয়াছিলেন তাহাকে বিবাহ করিতেই হইবে।

তখন কল্যাণীর বয়স ছিল সতের। অনাদরে, অযত্নে মাসীর বাড়ীতে সে বয়সের উপযুক্ত পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে নাই। তখন লোকে তাহাকে দেখিয়া তের চৌদ্দ বৎসরের একটী মেয়ে বলিয়াই ভাবিয়া লইত। বিবাহ হইবার পর মাত্র এক বৎসরের মধ্যে সে এমনভাবে সকল দিকেই পুষ্টিলাভ করিল যাহা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

সে আজ পাঁচ বৎসর পূর্ব্বের কথা। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যে মেয়েটী নববধূ হইয়া সসঙ্কোচে এই বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল সেই আজ গৃহিণী হইয়াছে।

এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিশ্বপতি এমন অধঃপতনের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে, যেখান হইতে তাহাকে টানিয়া তোলা কল্যাণীর পক্ষে একেবারে দুঃসাধ্য।

কিন্তু তথাপি সে চেষ্টা করে নাই কি? সে অনেক চেষ্টা করিয়াছিল, সবই ব্যর্থ হইয়া গেছে। সজল নয়নে সে যখন অনুরোধ করিত, "আর ও-সব ছাই-পাঁশ খেয়ো না, আমার মাথা খাও; এদিকে জমীজমা যা একটু

আছে সবই গেল। এদিকে আর সব যে যায়—এসব একটু দেখ।” তখন বিশ্বপতি কেবল হাসিত, উত্তর দিত, “সব দিকেই আমার নজর আছে রাঙা বউ, ভেব না কোন দিকে নজর দেই নে, কাজেই দশ ভূতে সব লুটে খাচ্ছে। বিষয়-সম্পত্তি জমীজমার দিকে একটা চোখ সদাই পড়ে আছে রাঙাবউ, বিশ্বপতি এমন নেশা করে না যাতে সব ঘুচাতে হবে।”

কিন্তু সে সর্ব্বদা একটা চোখ জমীজমার দিকে ফেলিয়া রাখিলেও সংসারের আয় ক্রমেই কমিয়া যাইতে লাগিল। সব গিয়া আজ একটী কুড়ি বিঘা জমী ও একটী ফলের বাগানই মাত্র অবশিষ্ট পড়িয়া আছে। কল্যাণীর অলঙ্কারগুলির কিছুই আজ নাই। হাতে কেবল মাত্র দুইটী শাঁখা তাহার আয়ত রক্ষা করিতেছে।

পাড়ার বর্ষিয়সী মেয়েরা সদুঃখে বলিতেন, “গয়নাগুলো পর্য্যন্ত ওই হতভাগাটাকে ধরে দিলে বউমা, আখেরের কথাটা ভেবে দেখেছ কোন দিন? ও যে রকম লক্ষীছাড়া তাতে কিছু রাখবে না। এর পরে হয় তো গাছতলায় মালা হাতে বসতে হবে। একমুঠো ভাতের জন্যে এর পরে লোকের দোরে দোরে ঘুরতে হবে যে—”

কল্যাণী প্রায়ই জবাব দিত না। যদি কখনও জবাব দিত—বলিত “গয়নায় আমার দরকারই বা কি? যাঁর গয়না তিনিই নিয়েছেন, ওতে আমার কথা বলবার—বাধা দেবারই বা অধিকার কোথায়?”

ভবিষ্যতে সত্যই ভিক্ষাপাত্র হাতে করিয়া গাছতলায় বসিতে হইবে কি না, লোকের দ্বারে দ্বারে একমুষ্টি ভাতের জন্য ঘুরিতে হইবে কি না, তাহা সে কোন দিনই ভাবে নাই। ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতের তমোময় গর্ভেই নিহিত থাক, বর্ত্তমান লইয়াই জগৎ, বর্ত্তমান লইয়াই মানুষ বিব্রত, ভবিষ্যতের ভাবনা এখন ভাবিতে গেলে চলে না।

যখন কল্যাণী শুনিতে পায় বিশ্বপতি বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভালো ছিল, বিবাহের পর হইতেই সে অধঃপাতে গিয়াছে; সে বিবাহ করিতে চায় নাই মা জোর করিয়া তাহার বিবাহ দিয়াছেন, তখন সে কিছুতেই দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিতে পারে না। আকাশের পানে তাকাইয়া সজল-নয়নে ডাকিত—"তবে কেনই বা বিয়ে দিয়েছিলে মা, এ বিয়ে দেওয়ার কি দরকার ছিল যা দেবতাকে পশু করে তুলেছে।"

কোন দিন সে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই—কি দুঃখে সে এমন করিয়া নিজেকে ধ্বংস করিল? এ কথা কতবার সে জিজ্ঞাসা করিবে ভাবিয়াছিল, জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া থামিয়া গেছে। মনে হইয়াছে, কাহাকে সে জিজ্ঞাসা করিবে? সে একদিন যখন মানুষ ছিল তখন জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর হয় তো পাইলেও পাওয়া যাইত। আজ সে বুদ্ধি, সে জ্ঞান ইহার যে নাই।

স্বামীর মাতাল অবস্থা সে জানে, চরিত্র-ভ্রংশের কথা সে জানে নাই। আজ কাত্যায়নী স্পষ্টই জানাইয়া দিয়া গেলেন বিশ্বপতি কায়স্থের সন্তান,—কিন্তু সে জানিয়া শুনিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে। অস্পৃশ্য বাগ্দী-বাড়ীতে সে দিন কাটাইয়া দেয়। তিনি নিজের চোখে তাহাকে জল খাইতে দেখিয়াছেন। বাগ্দীদের মেয়ে চন্দ্রাই ইহার মূল কারণ,—সেই মেয়েটাই কল্যাণীর স্বামীকে বিপথগামী করিয়াছে। চরিত্রহীনতার কথাটা ধ্বক করিয়া আসিয়া কল্যাণীর বুকে বাজিল।

আজ কয়েক দিন হইতে বিশ্বপতি সকাল সকাল সেই যে দুইটা ভাত মুখে দিয়া বাহির হয়, আর তাহার খোঁজ পাওয়া ভার হয়। আজ কয়-দিন ধরিয়া রাত্রে সে বাড়ী থাকে না।

কল্যাণী জিজ্ঞাসা করে নাই সে কোথায় যায়,—বলিতে পারে নাই

রাত্রে একা থাকিতে ভয় করে। বাড়ীর চারি দিকে বাগান। লোকালয় দূরে থাকায় সে চীৎকার করিলেও কেহ তাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইবে না।

আজ কল্যাণীর চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। কাত্যায়নী চলিয়া গেলেও সে উঠিল না, ঘরের কোন কাজে হাত দিল না, যেমন বসিয়া ছিল তেমনই বসিয়া রহিল।

২

সন্ধ্যার মৃদু অন্ধকার ধীরে ধীরে ধরার বুকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

বৈশাখের রৌদ্রতপ্ত দুপুরের সেই ধরিত্রীর এখন আর এক মূর্ত্তি। কেহ দেখিয়া বলিতে পারিবে না দুপুরে এই পৃথিবীই ভীষণ মূর্ত্তি ধরিয়াছিল।

গৃহস্থের বাড়ীতে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বলিয়াছে। কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীগণ গলায় আঁচল জড়াইয়া তখনই সবে তুলসীতলা প্রদক্ষিণ সমাপনান্তে পরিবারের মঙ্গল কামনায় প্রণাম করিতেছেন। প্রায় প্রতি গৃহ হইতে শঙ্খধ্বনি শ্রুতি-গোচর হইতেছে।

কল্যাণী তখনও বারাণ্ডায় চুপ করিয়া বসিয়া আছে। গৃহে এখনও সান্ধ্য-প্রদীপ জ্বালে নাই, প্রাত্যহিক শঙ্খনিনাদ করে নাই,—স্বামী ফিরিবে বলিয়া অন্য দিনের মত সে জল কাপড়, খড়মজোড়াটী ঠিক করিয়া রাখে নাই, আহার্য্য প্রস্তুত করিতেও যায় নাই।

বারাণ্ডার নীচে তাহারই স্বহস্ত-রোপিত কয়টী বেল ফুলের গাছে সাদা ফুলগুলি সান্ধ্য বাতাসের সুশীতল স্পর্শে কেবলমাত্র জাগিবার উদ্যোগ করিতেছিল,—মুদিত দলগুলি আস্তে আস্তে মেলিয়া দিতেছিল।

উঠানের দরজা ঠেলার শব্দ হইল। স্বল্প অন্ধকারের মধ্যে যে আসিয়া উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইল। তাহার পানে বারেক দৃষ্টিপাত করিয়াই কল্যাণী চিনিল এ কে।

বিশ্বপতি বড় ব্যস্তভাবেই বারাণ্ডায় উঠিয়া দাঁড়াইল, "তোমার চাবিটা

একবার দাও তো রাঙাবউ, বিশেষ দরকার পড়েছে, এখনি না দিলে চলছে না।"

কল্যাণী নীরবে চাবির গোছা অঞ্চল হইতে খুলিয়া সামনে ফেলিয়া দিল। চাবির গোছাটা তাড়াতাড়ি কুড়াইয়া লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া অন্ধকার দেখিয়া বিশ্বপতি থমকিয়া দাঁড়াইল, মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি, ঘরে এখনও সন্ধ্যে পড়ে নি ?"

কল্যাণী উত্তর দিল না। বিশ্বপতি দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিতেই সে জ্বলিয়া উঠিয়া একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই বলিল, "না, জ্বালা হয় নি,—আমার সময় হয় নি, গরজ পড়ে নি বলে; তোমার দরকার থাকে তুমি জ্বেলে নাও গিয়ে।"

কল্যাণীর মুখে এমন ধরণের কথা বিবাহ হইয়া অবধি আজ পাঁচ বৎসরের মধ্যে বিশ্বপতি শুনিতে পায় নাই। সে কতদিন মদ খাইয়া মাতলামি করিয়াছে, কতদিন নেশার ঝোঁকে আহার করিতে বসিয়া ভাত তরকারি পদাঘাতে দূর করিয়া দিয়া উঠিয়া গেছে,—কল্যাণী চিরকালের আদর্শ পতিব্রতা নারীর মতই প্রতি পদে তাহার দোষ ত্রুটী সারিয়া লইয়াছে,—কোন দিন তাহার সহিষ্ণুতা নষ্ট হয় নাই। সে যেন পৃথিবীর মতই পরম সহনশীলা। যত কিছু অত্যাচারই তাহার উপর দিয়া হইয়া যাক, সে নির্ব্বাক জড়ের মতই পড়িয়া থাকিবে, এই যেন তাহার চরিত্রের চিরন্তন রীতি।

আজ সেই সহনশীলা রমণীর মধ্যে এরূপ অসহিষ্ণুতা সত্যই বড় বিস্ময়কর বলিয়াই বোধ হইল, তাই বিশ্বপতি স্তম্ভিত হইয়া নির্ব্বাকে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার পরই সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "আলো

বাগলাটা এমন কিছু শক্ত নয় রাঙাবউ, ও কাজ আমি বেশ পারি। সব কাজই পারি—তবে হাতের কাছে সব জিনিস গুছানো পাই নে এইটেই হয় মুস্কিল। তোমরাই না এমনি করে আমার মাথা খেয়েছ রাঙাবউ। নিজের ওপরে যদি কতকটা নির্ভর করতে আমায় ছেড়ে দিতে,—দেখতে, আমি সব পারতুম, এমন কি রেঁধে ভাত খাওয়া পর্য্যন্ত। কিন্তু ওই যে গোড়াতেই মুস্কিল বাধিয়েছিলেন আমার মা। এতটুকু বেলা হতে—এটা করিস নে, ওটা করতে নেই, এমনি করেই না তিনি আমায় অধঃপাতে দিয়ে গেছেন। তার পর এলে পরের মেয়ে তুমি,—তুমিও মার কাছ হতে সেবা করা ব্যাপারটা হাতে কাজে শিখে নিলে। আমার আর অপরাধ কি বল? না চাইতে হাতের কাছে সব জিনিস পেয়ে এমন বদ অভ্যেস হয়ে গেছে যে নিজের কিছু করতে হবে ভাবতেও মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়। যাকগে, ঘরে আলো জ্বালা না হয় নাই রইল, সন্ধ্যেটা দিয়েছিলে তো?"

কঠিন সুরেই কল্যাণী বলিল, "না, দিই নি।"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বিশ্বপতি বলিল, "দাও নি? আমার ওপরে রাগ করে সন্ধ্যে বেলায় ভিটেয় সন্ধ্যেটা দিলে না রাঙাবউ?"

পরক্ষণেই সে আবার হাসিল, "আর পিতৃপুরুষের ভিটের কল্যাণ? যে গুণধর ছেলে জন্মেছি, তাঁদের নিত্যি একধাপ করে নামিয়ে নরকের পথেই নিয়ে যাচ্ছি। ওপরে তুলবার যোগ্যতা তো আমার হলনা, আর হবেও না। শুনছো রাঙাবউ, তোমার ঘরে কোথায় কি আছে তা তো কিছুই জানি নে, জানবার দরকার হয় নি, সে সুযোগও দাও নি। দেশালাই কোথায় দেখে শুনে আলোটা একবার জ্বালিয়ে দিলে হতো। ওদিকে বড্ড দরকার, দাঁড়াবার যো নেই।"

কল্যাণী রাগ করিয়াই উঠিল, এবং স্বভাবের বিপরীত পদশব্দ করিয়াই ঘরের মধ্যে গিয়া কোথা হইতে দেশালাই বাহির করিয়া প্রদীপটা জ্বালিয়া দিল।

আশ্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিশ্বপতি বাক্স খুলিতে খুলিতে বলিল, "এই তো, ফুরিয়ে গেল লেঠা, এই আলোটা সন্ধ্যেবেলা জাললেই বেশ হতো। দেখ দেখি অনর্থক বকতে গিয়ে কতটা দেরি হয়ে গেল! অথচ ওদের বলে এসেছি—এই আসছি—"

কল্যাণী বড় বড় দুইটী চোখ তুলিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্বামীর মুখের উপর রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাদের বলে এসেছিলে—চন্দ্রাকে?"

আচমকা চমকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়া বিশ্বপতি কল্যাণীর মুখের পানে তাকাইল। প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে সে চোখের দৃষ্টি সে দেখিতে না পাইলেও কণ্ঠস্বরে তাহা সে বেশই বুঝিতে পারিল।

বাক্স হইতে একখানা কাপড় তুলিয়া লইয়া সেখানা বগলে করিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। মৃদু হাসিয়া বলিল, "সত্যি ঠিক তাই। এই জন্যেই আমি তোমার ভারি সুখ্যাতি করি রাঙাবউ, কি করে তুমি এত খপর যোগাড় কর। ওই গুণটী তোমার সত্যি বড় চমৎকার! মার কিন্তু এসব বালাই ছিল না। যাক, এও বোধ হয় শুনেছ—চন্দ্রার মায়ের ভারি অসুখ হয়েছিল, কিন্তু বেচারাকে দেখতে কেউ ছিল না। অগত্যা আমিই তার সেবা শুশ্রূষা করেছি, ওষুধপত্তর এনে নিয়ে খাইয়েছি। কিন্তু সব যত্ন মিথ্যে করে বেটি শেষটায় মরে বাঁচল। তা যাক, ওতে দুঃখ নেই, বুড়ো মানুষগুলো জগৎ হতে যত সরে যায় ততই ভালো—বুঝলে? তোমার কপাল ভালো রাঙাবউ, মা বুড়ি বেশী দিন টেঁকল না। না হলে—বুঝলে, তোমার এমন গিন্নি হ'য়ে পাড়ায় পাড়ায় আমার

খবর নেওয়া পোষাত না ; তোমায় চিবিয়ে খেতো—" বলিতে বলিতে সে আবার অপর্য্যাপ্ত হাসিতে লাগিল।

কল্যাণী কি বলিতে গিয়া হঠাৎ চুপ করিয়া গেল। আস্তে আস্তে সে বাহিরে যাইতেছিল, বিশ্বপতি ডাকিল, "আহা, থামো রাঙাবউ, সত্যিই যে রাগ করে চললে দেখছি। আসল কথা তো তবু এখনও বলি নি, এতেই তোমার এত রাগ হল? চন্দ্রার মা সেই ভোরে মারা গেছে, সন্ধ্যে হয়ে গেল, বেটা বাগ্দীরা কেউ আসে নি। এই দিনটা ওদের বাড়ী বাড়ী ঘুরেছি, খোসামোদের একশেষ করেছি। এখন ওদের কর্ত্তা বললে—'টাকা দাও, তবে মড়া তুলব।' সত্যি বল রাঙাবউ, আমার কি বাপ মা মরেছে যে তার জন্যে টাকা যোগাড় করতে হবে আমারই?"

কল্যাণী শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "সে কথা ঠিক। কিন্তু ওই কাপড়খানা আর বাক্সের কোণে যে দু'টো টাকা ছিল ও দু'টো নিলে কি জন্যে বল দেখি?"

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বিশ্বপতি বলিল, "তাও দেখেছ? বাবাঃ, তোমাদের মেয়ে জাতের চোখের সামনে কিছু এড়িয়ে যাওয়ার যো নেই। কত হাত-চালাকী করে টাকা দু'টো নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজলুম, তাও কখন দেখে ফেলেছ। ভয় নেই গো, আজ মদ খাব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। তবু তুমি নিশ্চয়ই মনে করছো টাকা কাপড় কি হবে। ওই যে বললুম, ছোটলোক বেটারা কিছুতেই আসে না, কাজেই তাদের তাড়ি খাওয়ানোর খরচ, আর তাদের মোড়লকে এই কাপড়খানা দিতে হবে, নইলে মড়া উঠবে না যে।"

প্রদীপের নির্ব্বাপিতপ্রায় সলিতা বাড়াইয়া দিতেই তাহার আলো দৃপ্ত ভাবে কল্যাণীর কঠিন মুখখানার উপর ছড়াইয়া পড়িল। বিশ্বপতি

যাবে। তার পর সঙ্গে যদি না যাই, মড়াটাকে নদীর জলে ফেলে পালাবে। কাজেই বুঝতে পারছ আজ সারা রাতই শ্মশানে কাটবে।"

কি একটা কথা কল্যাণীর মুখে আসিয়াছিল, সে তাহা ফুটিতে দিল না। বারাণ্ডার ধারে দাঁড়াইয়া সে নক্ষত্র-শোভিত আকাশের পানে তাকাইয়া রহিল, স্বামীর দিকে আর ফিরিয়া চাহিল না।

দরজা পর্য্যন্ত গিয়া বিশ্বপতি আবার ফিরিয়া আসিল, "দেখ নেহাতই যদি ভয় করে, না হয় বল, আমি সনাতনকে বলে যাই, সে রাত্রে এসে বারাণ্ডায় শোবে এখন।"

যে কথাটা কল্যাণী চাপিয়া গিয়াছিল তাহা আর চাপা রহিল না; সে বলিল, "ভয় এতদিন হল না, আজকেই হবে, এমন ভয় আমার নেই। একা বাড়ীতে কেবল আজই থাকব না, এর আগেও কতগুলো রাত কাটিয়েছি সে কথাটা বোধ হয় তোমার মাথায় আসে নি। সে সব রাতে সনাতন বা আর কেউ আমায় পাহারা দিতে তো আসে নি; আজও কারও দরকার নেই।"

খুব খুসি হইয়াই বিশ্বপতি বলিল, "বেশ—বেশ, তা হলে তো আর কথাই নেই। তবে আমি চললুম রাঙাবউ। কোন ভয় নেই—বুঝলে না? ভয় করলেই ভয় হয়। তুমি জোর করে থাকো—দেখো, যদি ভয় লাগে তবে আমার নামই বিশ্বপতি নয়। দরজাগুলো বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হয়ে বসো গিয়ে।"

পরম নিশ্চিন্ত ভাবেই সে চলিয়া গেল।

কল্যাণী কতক্ষণ দাঁতে নীচের ঠোঁটটা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া উঠানের দরজাটার পানে তাকাইয়া রহিল। হঠাৎ তাহার বড় বড় দুইটী চোখ ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

৩

সনাতন আসিয়া ডাকিল—"দা-ঠাকুর, বাড়ী আছ নাকি?"

কল্যাণী গৃহমধ্য হইতে উত্তর দিল, "তিনি বাড়ীতে নেই সনাতন, এই খানিক আগে কোথায় বেরিয়েছেন।"

সনাতন মাথার ঝুড়িটা বারাণ্ডায় নামাইয়া শ্রান্তভাবে বসিয়া পড়িল; গামছাখানা খুলিয়া লইয়া গায়ের ঘাম মুছিতে মুছিতে বলিল, "তুমিই একবার বেরিয়ে এসো মা-লক্ষ্মী; এই আম কয়টা এনেছি দা-ঠাকুরের জন্যে, একটা পাত্র এনে তাতে নাও দেখি।"

একটা ঝুড়ি বাহির করিয়া আনিয়া কল্যাণী বলিল, "অনর্থক নিত্যি তোমার আম বয়ে আনা সনাতন; যাঁর নাম করে তুমি নিয়ে এসো, তিনি যে কত খান, তা আমিই জানি। দিনরাত বাইরে বাইরেই থাকেন,—কদাচিৎ বাড়ীতে আসেন। তা সে এমন অবস্থায় থাকেন—কি খাচ্ছেন না খাচ্ছেন সে জ্ঞানই থাকে না।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে আমগুলি নিজের ঝুড়িতে তুলিতে লাগিল।

সনাতন মুখটা কাঁচুমাচু করিয়া বলিল, "বুঝি তো সবই মা-লক্ষ্মী, তবুও তো মন মানে না। দা-ঠাকুরকে গাছের জিনিস না দিলে যেন তৃপ্তি পাওয়া যায় না, নিজের মুখে তোলা যায় না। সেদিনে দা-ঠাকুর আমাদের বাড়ী গিয়ে এই নতুন হিমসাগর আমের ভারি প্রশংসা করেছিলেন, তাই আজ গাছ হতে পেড়েই আগে ওঁর জন্যে এনেছি।"

কল্যাণী আমের ঝুড়ি গৃহমধ্যে রাখিয়া আসিয়া বারাণ্ডায় বসিল, "বোস সনাতন, দু'টো কথাবার্ত্তা বলি। তোমার মেয়ের খবর পেয়েছ সনাতন? ভালো আছে তো সে? নাতি-নাতনী ভাল আছে?"

সনাতন উত্তর দিল, "তোমাদের মুখের আশীর্ব্বাদে মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনী সব ভাল আছে,—প্রায়ই ওদের খবর পাই। এইবার একবার ওদের নিয়ে আসব মনে করছি। দেখি, যদি এই হপ্তায় যেতে পারি ওদের ওখানে, একদিন ছুটি করে যাব।"

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কল্যাণী বলিল, "আমাদের বাগানটা কত টাকায় বিক্রী হয়েছে এ বছরে সনাতন?"

উৎফুল্ল মুখে সনাতন বলিল, "তা অনেক টাকায় হয়েছে মা, দা-ঠাকুর সে সব কথা কিছু বলেন নি বুঝি? এ অঞ্চলে এবার কোন গাছেই প্রায় আম হয় নি। কিন্তু তোমাদের কোন গাছেই আম বাদ যায় নি,—সব গাছেই কিছু না কিছু ফল হয়েছে। অন্য বছর ঐ বাগান পাঁচ সাত টাকায় বিক্রী হয় না,—এ বছর ষাট টাকায় বিক্রী হয়ে গেছে। তারা সব টাকা এখনও দেয় নি, অর্দ্ধেক পরে দেবে কথা আছে।"

কল্যাণী গোপনে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। স্বামী একটা কথাও তাহাকে বলে নাই,—একটী টাকাও সে দেখিতে পায় নাই। এ সব টাকা কোথায় গেল,—চন্দ্রার বাড়ী কি?

"আচ্ছা সনাতন, তোমার দা-ঠাকুর আজকাল এত বাইরে বাইরে থাকেন কেন বলতে পার? আজকাল রাত্রেও বড়-একটা বাড়ী আসেন না, অথচ—"

সনাতন বাধা দিয়া বলিল, "সে সব জানি মা, আমার কাছে কোন্ কথাই বা গোপন থাকে? দা-ঠাকুরের মত মানুষ গাঁয়ে আর একটী

আছে—কেউ বলুক দেখি? কোথায় কার কি হয়েছে,—সারা দিন-রাত না খেয়ে না ঘুমিয়ে সেই রোগীর পাশে কাটিয়ে দিতেন। এই মাঝের বছর তিন-চার আর সে উৎসাহ ছিল না মা, হঠাৎ আবার ফিরেছে। কোথায় কে কোন্ বিপদে পড়েছে সেই নিয়েই আবার ঘুরছেন। শুনলুম মহেশপুরে নাকি খুব মারধোর হাঙ্গামা চলেছে, দা-ঠাকুর নিশ্চয়ই সেখানে ছুটেছেন।"

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া কল্যাণী বলিল, "মারধর কেন চলল সনাতন, কাদের সঙ্গে হল?"

সনাতন শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "যাদের সঙ্গে যাদের হয়, আর কার সঙ্গে হবে মা? বড়লোক চিরদিনই ধনগর্ব্বে অন্ধ হয়ে গরীবকে পীড়ন করে। গরীব যদি না সইতে পারে তখনই মারধর চলে। এখানেও হয়েছে ঠিক তাই—প্রজারা জমীদারের বাকি খাজনা দিতে পারে নি, তাই জমীদারের হুকুমে ওদের সর্ব্বস্ব ক্রোক হয়ে যায়। প্রজারা অনেক সইলেও আর সইতে পারছে না,—ক্ষেপে উঠে মারধর সুরু করে দিয়েছে।"

শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া বিবর্ণমুখে কল্যাণী বলিল, "সেখানে—সেই বিপদের মধ্যে তোমার দা-ঠাকুর গেলেন,—কি হবে সনাতন? একে তো ও-মানুষ মোটেই সুবিধার নয়, একটু কিছুতেই ওঁর মাথা গরম হয়ে ওঠে। তাতে এই রকম ব্যাপারের মধ্যে গিয়ে পড়ে যদি আর একটা কাণ্ড বাধিয়ে বসেন?"

সনাতন বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে ভয় করো না মা-লক্ষ্মী; পাঁচ ছয় বছর একত্রে বাস করেও তুমি দা-ঠাকুরকে চিনতে পার নি, আমরা এতটুকু বেলা হতে দেখছি ওঁকে, সেই জন্যেই খুব চিনি। আজই না হয় সেয়ানা হয়ে, নেহাৎ ভদ্দর লোককে নাম ধরে ডাকতে নেই বলেই

দা-ঠাকুর বলি, নইলে ও তো আমাদের চিরকালের বিশু, ওকে না চেনে কে? অমন একটা মানুষ এ অঞ্চলে নেই। কারও দুঃখ কষ্ট শুনলে পাগল হয়ে যান, কারও অন্যায় কোন দিন সইতে পারেন না। এই যে রামা বাগ্দীর মায়ের অমন ব্যায়রামটা হল, কেউ তাকে একটীবার চোখের দেখা দেখলে না। তখন এই দা-ঠাকুরই না ভিজিট দিয়ে পাঁচ-সাত দিন ডাক্তার এনেছে, ওষুধের দাম পথ্যি সব যুগিয়েছে। ঘরে তুমি মা-লক্ষ্মী দা-ঠাকুরকে যা খুসি বলতে পার, বাইরে আমরা তাঁকে দেবতা বলেই জানি।”

কল্যাণী মলিনমুখে বলিল, “কিন্তু অন্যায় সইতে পারেন না বলেই না ভয় পাচ্ছি সনাতন। ওখানে গিয়ে অন্যায় সইতে না পেরে হয় তো জমীদারের বিপক্ষে লাঠি ধরে দাঁড়াবেন।”

সনাতন বলিল, “সে গোল কাল মিটে গেছে মা-লক্ষ্মী। আজ তাদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্ত্তা চলেছে বটে, দুই পক্ষের কেউ সামনাসামনি নেই যে মারামারি বাধবে। দা-ঠাকুর এখনই এলেন বলে, তোমার ভয়ের কোনও কারণ নেই।”

কল্যাণীকে সান্ত্বনা দিয়া সনাতন বিদায় লইয়া চলিয়া গেল।

উনানে তরকারী চড়ানো ছিল, কল্যাণী সেখানে আসিয়া বসিল, অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাব।

বেলা প্রায় বারোটার সময় বিশ্বপতি বড় শ্রান্তভাবে ফিরিয়া আসিল। সে জুতা যোড়াটা একপাশে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়াল হেলান দিয়া বসিয়া পড়িল। কল্যাণী তাড়াতাড়ি একখানা পাখা লইয়া আসিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

তাহার হাত হইতে পাখাখানা কাড়িয়া লইয়া বিশ্বপতি মলিন হাসিয়া বলিল, “থাক, আর অতটা আদুরে দুলাল করে তুল না রাঙাবউ। অমনি

করেই না সব রকমে আরও আমার মাথাটা খাচ্ছ, নিজের একটু হাত নাড়ার পর্য্যন্ত ক্ষমতা দিচ্ছ না। তুমি বস এখানে, আমি নিজে বাতাস খাচ্ছি।”

রুষ্ট হইয়া কল্যাণী বলিল, “বকো না বলছি, পাখা দাও, আমি বাতাস করি। এই রোদে তেতে-পুড়ে এলে, না হয় একটু বাতাসই করলুম, তাতেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না, তুমিও চিরকেলে আলসে কুড়ে হবে না।”

নিশ্চিন্তভাবে নিজেই পাখার বাতাস করিতে করিতে বিশ্বপতি বলিল, “তবে আসল কথা বলি রাঙাবউ—শোন—আমি এখন একটু একটু করে স্বাবলম্বী হ'তে চাই। বলা তো যায় না রাঙাবউ—যদি সেই দিনই আসে—যেমন করে আমায় ফেলে মা অনন্তের পথে যাত্রা করেছেন, তুমিও তেমনি করে হয় তো চলে যাবে। তখন কিন্তু আমি সেকালের সতীদের মত তোমার অনুগমন করতে চিতায় পুড়ে মরব না বা আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করব না—এ কথা ঠিক। আমায় যখন বেঁচে থাকতেই হবে তখন কাজকর্ম্ম কিছু কিছু নিজের হাতে করার অভ্যেস রাখাটা কি ভালো নয় রাঙাবউ ?”

সে প্রচুর হাসিতে লাগিল ; কিন্তু কল্যাণীর মুখখানা রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে একটী কথাও বলিল না।

বিশ্বপতি পাখা রাখিয়া উঠিতে উঠিতে বলিল, “ওই দেখ, অমনি তোমার রাগ হয়ে গেল। আরে বাপু,—ভালো কথাটা বললেও যদি রাগ কর, তবে আমি বেচারা যাই কোথায় ? সত্যি কথা বল—তুমি যদি আজ না থাকো, আমায় কি একমুঠো ভাতের জন্যে লোকের দোরে দোরে ঘুরতে হবে না ?”

রুদ্ধ রোষে ফুলিতে ফুলিতে চাপা সুরে কল্যাণী বলিল, "ভয় নেই, যম আমার মত হতভাগীকে ছুঁতে পারবে না।"

বিশ্বপতি কথাটা মানিয়া লইল—"না ছুঁতে পারে, কিন্তু মানুষই যদি সে কাজটা করে?"

কল্যাণী গর্জ্জিতে লাগিল, একটী কথাও তাহার মুখে ফুটিল না।

বিশ্বপতি বলিল, "যাক গে, স্নানটা সেরে আসা যাক। পুকুরের জল বোধ হয় এতক্ষণ গরম হয়ে গেছে—না?"

কল্যাণী বাহির হইতেছিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ঘরে জল আছে—দেব?"

"না থাক, পুকুরেই যাই।"

বলিয়া মাথায় একটু তৈল দিয়া গামছাখানা লইয়া বিশ্বপতি বাহির হইয়া গেল।

আহারের স্থান করিয়া দিয়া কাপড় ও খড়ম যোড়াটী যথাস্থানে রাখিয়া কল্যাণী স্বামীর জন্য ভাত বাড়িতে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

একটু পরেই বিশ্বপতি ফিরিয়া আসিল। ভিজা কাপড় ছাড়িয়া আহার করিতে বসিয়া গেল। কল্যাণী একখানা পাখা লইয়া নিকটে বসিয়া মাছি তাড়াইতে লাগিল।

আহার করিতে করিতে বিশ্বপতি একবার মুখ তুলিয়া কল্যাণীর বিমর্ষ অথচ গম্ভীর মুখখানার পানে তাকাইল, বলিল, "আমার কথা শুনে রাগ করেছ রাঙাবউ ?"

কল্যাণী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না, রাগ করব কি জন্যে,—রাগ করার মত কি কায হয়েছে ?"

মৃদু হাসিয়া বিশ্বপতি বলিল, "অত ভদ্রভাবে মিষ্ট কথা নাই বা বললে রাঙাবউ, ওর চেয়ে বরং খুব চেঁচিয়ে ঝগড়া করাও ভালো। যাক গিয়ে, ও-সব কথা আর না তোলাই ভালো—কি বল রাঙাবউ ? এবার এসো—ঘর-কন্নার কথা দু'টো বলা যাক—কেমন ? আমায় একটা তরকারী রাঁধতে শিখিয়ে দেবে রাঙাবউ,—সেই যে মোচা দিয়ে কি একটা তরকারী করে—"

চকিতে কল্যাণীর মনে পড়িয়া গেল বিশ্বপতি মোচার ঘণ্ট বড় ভালবাসে, এবং কয়েক দিন পূর্ব্বে সে নিজের হাতে বাগান হইতে দুইটী মোচা কাটিয়া আনিয়াছিল ; এবং ইহার তরকারী খাইবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে মনের অবস্থা খারাপ হইয়া যাওয়ায় কল্যাণীর এ তরকারী আর রন্ধন করা হয় নাই।

স্বামী হয় তো আজ আশা করিয়াছিল তাহার সে তরকারী হইয়াছে! থালার দিকে তাকাইয়া সে—কেন হয় নাই, সে কৈফিয়ৎ চাহিল না।

কল্যাণীর মুখখানা লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে নতমুখে চুপ করিয় বসিয়া রহিল।

বিশ্বপতি তাহার আরক্ত মুখের পানে চাহিয়া বেশ বুঝিতে পারিল সে লজ্জিতা হইয়াছে; সে প্রসঙ্গ আর না তুলিয়া সে বলিল, "কই, জিজ্ঞাসা তো করলে না—আজ সকালেই কোথায় গিয়েছিলুম, এত বেলা করে বাড়ী ফিরলুম কেন?"

একান্ত উদাস ভাবেই কল্যাণী উত্তর দিল, "জিজ্ঞাসা করবার দরকার নেই বলেই করি নি। এই যে নিত্যি এখানে যাও ওখানে যাও, কত রাতও এখানে ওখানে কাটিয়ে এসো, কোন দিন জিজ্ঞাসা করেছি কি? তুমি কোথায় গেছ, কেন গেছ? জানি জিজ্ঞাসা করলেও তার সত্যি উত্তর কখনও তুমি দেবে না, উল্টে প্রশ্ন তুলবে—সে কথা জিজ্ঞাসা করার কারণ কি।"

হাতের ভাত মাখা হঠাৎ স্থগিত রাখিয়া বিশ্বপতি সোজা হইয়া বসিয়া স্ত্রীর পানে তাকাইল।

কল্যাণী বলিল, "খেয়ে নাও, আবার চুপ করে বসে রইলে কেন?"

বিশ্বপতি বলিল, "একটা কথা বলে নেই আগে রাঙাবউ, তার পর খাচ্ছি। আচ্ছা, তুমি যে অত বড় অপবাদের বোঝা আমার মাথায় চাপালে,—সত্যি করে বল দেখি তুমি কোন দিন জিজ্ঞাসা করেছ কি? আমার তো মনে পড়ে না, তুমি কোন দিন কোন কিছু জানতে চেয়েছ, আর আমি তার উত্তর দিই নি। তুমি নিজে কি রকম নির্লিপ্ত ভাবে থাকো, সেটা একবার ভেবে দেখ, তার পর আমায় দোষ দিয়ো।"

সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল দেখিয়া কল্যাণী ব্যস্ত হইয়া উঠিল, বলিল, "কথা রাখ, আগে খেয়ে নাও, তার পর কথাবার্ত্তা যা হয় বলো এখন।"

বিশ্বপতি আবার আহারে মন দিল।

কল্যাণী বলিল, "সনাতনের মুখে শুনলুম মহেশপুরে না কোথায় মারামারি হয়েছে—সেখানে গিয়েও বোধ হয় কর্ত্তৃত্ব করে এলে?"

হাসিমুখে বিশ্বপতি বলিল, "এই যে, সে খবরটাও রেখেছ দেখতে পাচ্ছি। কর্ত্তৃত্ব বিশেষ কিছুই করি নি! করবার যোগ্যতা হয় তো আছে, কিন্তু তা মানছে কে? তোমার স্বামীর অক্ষমতা তুমি যা জানো, দেশের আর দশজনেও তাই জানে। কাজেই তারা আমায় আমল দেবে কেন?"

দৃপ্ত হইয়া উঠিয়া কল্যাণী বলিল, "হ্যাঁ, সে যোগ্যতা তোমার বেশ আছে। তুচ্ছ ঘরের কাজে তোমার যোগ্যতা না থাকলেও থাকতে পারে, —এ সব বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করবার যোগ্যতা তোমার বেশ আছে। গেল বছর নবীন ভশচার্য্যের পক্ষ নিয়ে গাঁয়ের পাঁচটা ছেলের সঙ্গে বাজারে মারামারি করে এসেছিলে, না; যার জন্যে শেষে পুলিশ পর্য্যন্ত এসেছিল?"

মুখখানা গম্ভীর করিয়া বিশ্বপতি বলিল, "বাঃ সে কথা এখনও ভোল নি দেখছি। কিন্তু সে কাজ করা যে অন্যায় হয় নি—একজন বুড়ো বামুনকে যারা অবশেষে বিদ্রূপ করেছিল, তাদের মারা যে অন্যায় নয় বরং উচিতই হয়েছিল, এ কথা আজ স্বীকার না করলেও সে দিন তো অন্তরের সঙ্গে স্বীকার করেছিলে রাঙাবউ।"

কল্যাণীর মুখে বিশ্বের গাম্ভীর্য্য জমা হইয়াছিল,—সে নিস্তব্ধে অন্যমনস্ক ভাবে বসিয়া রহিল। বিশ্বপতি ততক্ষণে আহার শেষ করিয়া উঠিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "ও সব ভেবে আর মাথা খারাপ কোর না,

খেয়ে-দেয়ে নাও এখন। ভয় করো না, আজ আমি অন্যায়ের বিপক্ষে দাঁড়াই নি যাতে পুলিস আসবে। ওখানে দাঁড়ানোর যোগ্যতা আমার নেই, প্রতিপক্ষ খোদ জমীদার নিজে; দাঁত বসাতে গেলে সে দাঁতই ভেঙ্গে যাবে, রক্তপাত নিজেরই হবে, প্রতিপক্ষের গায়ে এতটুকু আঁচড় লাগবে না।"

একলা ঘরে কল্যাণী ভাতের থালাটার পানে তাকাইয়া বসিয়া রহিল। তাহার চোখ দিয়া নিঃশব্দে কেবল অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

কি লোক, ইহাকে কোন মতে বিদ্ধ করা যায় না তো। ওই তো শেষের দিকে বলিয়াই গেল—অক্ষম যদি প্রাণপণ বলে দাঁত বসায় তাহাতে তাহার দাঁতই ভাঙ্গিয়া যায়, রক্তপাত হয়, প্রতিপক্ষের তাহাতে এতটুকু ক্ষতি হয় না।

মানুষটা সংসারে থাকিয়াও যেন নাই। এমন অনাসক্ত লোক সংসারে খুব কমই দেখা যায়। সংসারে যে আরও একটা মানুষ আছে, সে মানুষটা যে তাহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া বাঁচিয়া আছে, তাহা যেন কোন মতে উহাকে বিশ্বাস করান যাইবে না, ওই লোকটা সে কথা সম্পূর্ণ হাসিয়াই উড়াইয়া দিবে।

এমন লোকের উপর নির্ভর করিলেও সে নির্ভরতা স্থায়ী হয় না। ও যেন অনন্ত সমুদ্র, নিজের মনে গান গাহিয়া চলিয়াছে, উহার পা কূল আছে কি না সে সন্ধান সে রাখে নাই।

ইহাকে যাহাই দাও, ও ফিরাইয়া দিয়া যাইবে, কিছুই লইবে না। লোকে জানে সবই, জানিয়াও এই সমুদ্রকে সব দিতে চায়, দেয়ও।

কল্যাণী চায় নির্ভর করিতে, কিন্তু ও তো আমল দেয় না। উহাকে কল্যাণী কত না কঠোর কথা বলিয়া যায়, কিন্তু ও যে সব হাসিয়া উড়াইয়া

দেয়। নিজের কাজে নিজেই সে ভুলিয়া রহিয়াছে,—সামনে যে পথ রহিয়াছে। তাহাই ধরিয়া সম্মুখের পানে দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়াছে, পাশে কে আছে—পিছনে কে আছে তাহা সে কোন দিন ফিরিয়া দেখে নাই।

আচমন সমাপনান্তে বিশ্বপতি বাহির হইতে ডাকিল, "আমি তা হলে বার হচ্ছি রাঙাবউ, ওদিকে আমার কাজ আছে। তুমি খেয়ে-দেয়ে নিয়ে বসো—"

আর্দ্র-কণ্ঠে কল্যাণী বলিল, "হবে এখন, তুমি তোমার কাজে এখন যাও, দেরী করো না।"

কণ্ঠস্বরের আর্দ্রতা স্পষ্ট অনুভব করিয়াই সন্দিগ্ধ মনে বিশ্বপতি দরজায় দাঁড়াইয়া ভিতর দিকে উঁকি দিল। তাহার আসিবার সাড়া পাইবার সঙ্গে সঙ্গেই কল্যাণী চট করিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিয়া দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া নিজের জন্য ভাত বাড়িতে বসিল।

সেদিন গ্রাম্য নদী ইচ্ছামতীর ঘাটে স্নান করিতে গিয়া সামনে চন্দ্রাকে দেখিয়াই কল্যাণী থমকিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রার পরণে সুন্দর একখানি কালো ফিতা-পেড়ে শাড়ি, দুই হাতে সবুজ রংয়ের রেশমী চুড়ি, গৌর বর্ণের উপর মানাইয়াছিল বেশ। একরাশ কালো কোঁকড়া চুল সমস্ত পিঠখানা ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল। সেই কালো চুলের মাঝখানে তাহার সুন্দর মুখখানা সত্যই বড় সুন্দর দেখাইতেছিল।

সামনে যদি একখানা আয়না থাকিত, কল্যাণী চট করিয়া নিজের মুখখানা একবার দেখিয়া লইত। চন্দ্রার এই সৌন্দর্য্য সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না। নীচ বাগ্দি-কন্যা, তাহার এত রূপ কেন?

অন্তরটা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাই মুখখানা অন্ধকার করিয়াই কল্যাণী এক পাশ দিয়া জলে নামিয়া গেল,—অতি সন্তর্পণে—যেন চন্দ্রার স্পর্শ না লাগে। চন্দ্রা কাপড় কাচিতেছিল, জল ছিটকাইয়া কাছে পড়িতেই কল্যাণী কণ্ঠে বিষ ঢালিয়া দিয়া বলিল, "আ মর, চোখের মাথা তো এখনও খাস নি চন্দ্রা! ঘাটে মানুষ রয়েছে দেখতে পাচ্ছিস নে? তুই জাতে বাগ্দি তা মনে আছে? তোর জল গায়ে লাগলে এই অবেলায় আবার আমায় নেয়ে মরতে হবে সে খেয়ালটুকু আছে?"

তরুণী মেয়েটির মধ্যেও অনেকখানি দুষ্টামী ছিল। হয় তো সে সাবধান হইয়াই কাপড় কাচিত যদি কল্যাণী তাহার সমবয়স্কা না হইয়া বয়সে বড় হইত। সে অকুন্ঠিত ভাবেই কাপড় আছাড় দিতে দিতে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "তা কি করব বাপু, চোখের মাথা না খেলেও খেতে

হয়েছে। তোমাদের ভদ্দর লোকের জ্বালায় তো ঘাটে কাপড় কাচবার যো নেই। যখনই কাপড় আনব—দেখব ঘাট-ভরা লোক, আর শুনব—ছুঁস নে, ছুঁস নে।"

বিকৃত মুখে কল্যাণী বলিল, "বলবে নাই বা কেন? তোরা জাতে বাগ্দি, তোদের ছুঁয়ে চান না করলে ঘরে যাওয়া তো চলে না। তোদের উচিত নিত্যি যখন এত কাপড় কাচা—তখন আর একটা ঘাট করা। এক ঘাটে বামন কায়েতের সঙ্গে তোরাও আসবি,—তোদের তো মুস্কিল নয়, মুস্কিল হয় যে আমাদেরই।"

চন্দ্রা এবার স্পষ্টই হাসিয়া ফেলিল, "বেশ তো ঠাকরুণ, তোমরা সবাই মিলে একটা আলাদা ঘাট যদি করে দাও, আমাদেরও নিত্যি তোমাদের কথা শুনতে হয় না। দাদাবাবুকে বলব এখন—ওই পাশটা পরিষ্কার করে যদি একটা ঘাট করে দেন—"

দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া কল্যাণী বলিল, "কেন, দাদাবাবুর কি বাপ-মা মরা দায় পড়েছে যে তোর জন্যে ঘাট তৈরী করে দিতে যাবে? আরও তো অন্য লোক আছে, তাদের দিয়ে করিয়ে নে গিয়ে।"

চন্দ্রা বলিল, "অন্য লোক আর কোথায় পাব গো ঠাকরুণ। দাদা-বাবুই আসেন যান, নিত্যি বাজার হাটও করে দেন, যা কাজ পড়ে তাও করে দেন। যাই বল ঠাকরুণ, দাদাবাবুর মত আর একটী পাওয়া দুষ্কর। কায়েতের ছেলে, তবু জাতের অহঙ্কার নেই। নিত্যি বাগ্দি বাড়ী যাওয়া আসা করেন। তোমাদের মত অত আচার-বিচার নেই। লোকের উপকার ওঁর মত অমন ভাবে আর কেউ করতে পারবে না, এ কথা সবাই বলবে। আমি তো ময়লা কাপড়েই থাকতুম, কেবল দাদাবাবুর বকুনিতেই না তিন দিন অন্তর কাপড় সেদ্ধ করতে হয়। উনি যে মোটেই ময়লা

সইতে পারেন না। আজ গিয়ে বলব এখন, ঘাটে কাপড় কাচলে ঠাকরুণ বকেন, আলাদা ঘাট না করে দিলে কাপড় কাচা হবে না।”

দুষ্টামীভরা মুখে সে কল্যাণীর পানে তাকাইয়া রহিল।

কল্যাণী কথা বলিতে পারিল না। ক্রোধে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে কেবল দুইটী চোখে অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। যদি সম্ভব হইত তাহা হইলে চোখের আগুনে সে এই অস্পৃশ্যা দুর্ভাগিনীকে দগ্ধ করিয়া ফেলিত।

চন্দ্রা বিনীতভাবে বলিল, “এখন আজ তো ওঠো ঠাকরুণ, কাপড়খানা আর একবার আছাড় দিতে দাও। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আমার বাড়ীতে যাওয়া আসা করে বলে দাদাবাবুকে ঘেন্না কর না তো,—ঘরে-দোরে উঠতে দাও তো?”

ঘৃণায় কল্যাণীর পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত শিরশির করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি ঘড়াটা ডুবাইয়া লইয়া এক পাশ কাটাইয়া দ্রুতপদে উঠিয়া গেল। পিছনে অস্পৃশ্যা বাগ্দির মেয়েটী যে প্রচুর হাসিয়া একেবারে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল, তাহা সে পিছন ফিরিয়াও দেখিল না।

বাড়ীতে ফিরিয়া ঘড়াটা দুম করিয়া বারাণ্ডায় নামাইয়া কাপড় ছাড়িয়া সে রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

চন্দ্রার মুখে বিজয়িনীর হাসি; নীচ বাগ্দিনী তাহাকে গ্রাহের মধ্যে আনে না, তাহাকে দশ কথা শুনাইয়া দিল!

তাহার স্বামী চন্দ্রার হাট-বাজার করিয়া দেয়, তাহার বাড়ীতে অনেক সময় কাটাইয়া দেয়। উঃ, এ কথাটা মনে করিতেও ঘৃণায় সমস্ত শরীর ও মন সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। মানুষের কি জঘন্য প্রবৃত্তি! ইহারা জাতি-ধর্ম্ম কিছুই মানে না!

ছিঃ, যে স্বামী বাগ্দির বাড়ী যাতায়াত করে, নিজের জাতিধর্ম্ম যে বিসর্জ্জন দিয়াছে, তাহারই উচ্ছিষ্ট সে আহার করে। দেবতা ভাবিয়া সে কাহাকে অর্ঘ্য সাজাইয়া দিতেছে! না, এখন হইতে সে সতর্ক হইবে; স্বামী-সেবা সে করিবে, তাই বলিয়া নিজের ধর্ম্ম সে ঘুচাইবে না।

কিন্তু এ কল্পনাতেও সে চিত্তে শান্তি পাইল না। স্বামীকে জব্দ করিবার উপায় কি? এমন শাস্তি দেওয়া আবশ্যক যাহা ওই নির্লিপ্ত লোকটীর মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথিয়া যায়; সে বুঝিতে পারে—অনুতাপ করে। মরিয়া তাহাকে জব্দ করিতে পারা যায়, কিন্তু সে যে অনুতাপ করিবে তাহা তো কল্যাণী দেখিতে পাইবে না, তবে সেরূপ জব্দ করিয়া ফল কি?

দিন কয়েকের জন্য মাসীমার বাড়ী চলিয়া গেলে হয় না? মাসীমা সেবার তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য নিজের ছেলেকে পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সে যায় নাই। বিশ্বপতি তাহাকে যাইবার অনুমতি দিয়াছিল, কিন্তু তাহারই কষ্ট হইবে ভাবিয়াই কল্যাণী যায় নাই।

"বউদি, বাড়ী আছ নাকি?"

সমবয়স্কা রমা কখন বারাণ্ডায় উঠিয়াছিল তাহা কল্যাণী জানিতেও পারে নাই। ডাক শুনিয়া সচেতন হইয়া সে উত্তর দিল, "হ্যাঁ, আছি।"

ঘরের দরজায় উঁকি দিয়া রমা বলিল, "বাপ রে, এখন ওই অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসে কি করছ ভাই?"

কল্যাণী বাহির হইয়া আসিল, একখানা পিঁড়ি পাতিয়া দিয়া শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "বসো ভাই।"

রমা পিঁড়িখানা সরাইয়া রাখিয়া মেঝেয় বসিয়া বলিল, "কখন এসেছি, ডেকে ডেকে ফিরে যাচ্ছিলুম। তার পর হঠাৎ রান্নাঘরের দরজা খোলা দেখে মনে হল ঘরেই আছ, কোথাও যাও নি। ওই অন্ধকার ঘরে

চুপচাপ বসে কি করছিলে বল দেখি? কাজ যে কিছুই করছিলে না তা দেখেই বুঝেছি।"

কল্যাণী বলিল, "কাজ ছিল না কি রকম? উনোন ধরানোর চেষ্টা করছিলুম। তার পর ভাত চড়াব, মসলা পিষব, তরকারী কুটব—"

বাধা দিয়া মুখ ঘুরাইয়া রমা বলিল, "ওগো হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সব জানি, বুঝাচ্ছ কাকে? আর কেউ হলে তাকে যা তা বলে বুঝাতে পারতে। আমার চোখে ধূলো দেওয়া বড় সহজ কথা নয়। দাদার ব্যবহারের কথা ভাবছিলে,—না? কবে পুরী যাচ্ছেন সে সব কথা শুনেছ কিছু—বলেছেন?"

যেন আকাশ হইতে পড়িয়া কল্যাণী বলিল, "পুরী যাওয়া কি রকম?"

রমা বলিল, "আহা, যেন উনি কিছুই জানেন না? দাদা নন্দার সঙ্গে পুরী যাচ্ছে, এ কথা গাঁয়ের সকলেই শুনেছে,—শুনতে পাওনি শুধু তুমি; তাই নিরিবিলি অন্ধকার রান্নাঘরে একলা বসে ভাবছিলে আর চোখ মুছছিলে—না?"

কল্যাণী সগর্জ্জনে প্রতিবাদ করিল, "কক্ষণ না। আমার চোখের জল এত সস্তা নয় যে একটু আঘাত লেগেই ঝরে পড়বে রমা।"

রমা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "ভালো কথা, সে জন্যে তোমায় তো নিন্দে করছি নে ভাই বউ-দি; বরং প্রশংসাই করছি। কিন্তু সত্যি বল দেখি ভাই—দাদার এখনও কি ওই নন্দার আঁচল ধরে ওর পেছনে পেছনে বেড়ানো ভালো দেখায়? তুমি সে সব কথা শুনেছ—না?"

একেবারে মলিন হইয়া গিয়া কল্যাণী বলিল, "না, আমি কিছুই শুনি নি। তুমি একদিন কি সব বলবে বলেছিলে—"

রমা মাথাটা কাত করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, বলব ভেবেছিলুম ; কিন্তু দরকার হয় নি বলেই বলি নি। ভেবেছিলুম, দাদা নিজের ভুল সামলাতে পেরেছেন। এখন দেখছি মাকাল ফলের গুণ পরীক্ষা ক'রে ঠকলেও পাখীরা ওর রং দেখেই ছুটে যায়। নন্দাকে দেখেছ কি বউ-দি? দাদা একতালে তাকেই বিয়ে করবার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। নন্দাও কতদিন আমাদের সঙ্গে বলেছিল—সে দাদাকে ছাড়া আর কাউকেই বিয়ে করবে না, তার জীবনপণ। কিন্তু বিয়ে হল না,—নন্দার বাবা তাকে গরীবের হাতে দিতে রাজি হন নি। তাঁর তো ওই একটী মাত্র মেয়ে, তার ওপর মেয়ে সুন্দরী। কাজেই তিনি বড়ঘরে মেয়েকে দেওয়ার আশা করেছিলেন। হলও ঠিক তাই ;—মেয়ের পেছনে তিনি অজস্র টাকা ঢাললেন, তার বিয়ে হল, জমীদারের একমাত্র শিক্ষিত ছেলের সঙ্গে, আর দাদার বিয়ে হয়ে গেল তোমার সঙ্গে।"

কল্যাণীর মনে হইল তাহার চোখের সামনে আজ পাঁচ বৎসর ধরিয়া যে কৃষ্ণ-যবনিকা পড়িয়া ছিল, তাহা হঠাৎ উঠিয়া গেল। কল্যাণী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল মাত্র।

একটু থামিয়া ক্ষীণকণ্ঠে সে বলিল, "নন্দাকে আমি দেখি নি, তবে সে যে খুব সুন্দরী তা শুনেছি।"

রমা বলিল, "দেখবে কি করে? নন্দার বাবা এই রকম সব গোলমাল দেখে মেয়েকে নিয়ে কলকাতায় যান। সেখানেই বিয়ে হয়। তার পর তাঁরা আর দেশেই আসেন নি। নন্দার বাবা মারা গেলে ওর মা এই এক বছর মাত্র দেশে ফিরেছেন। নন্দাও এই সবে দশ দিনের করারে ছয় বছর পরে দেশে পা দিয়েছে।"

কল্যাণী একটুকরা হাসি শুষ্ক ওষ্ঠে ফুটাইয়া তুলিয়া বলিল, "কিন্তু সেই

পুরানো পচা ভালোবাসাটা আজও ওদের দু'জনের কেউ ভুলতে পারে নি বলে মনে হয়,—না ?"

রমা মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "দুর, তা কি ভোলা যায় ? ভালোবাসা জিনিসটা যদি অত অল্পেতেই মিলিয়ে যেত, তা হলে আর ভাবনা থাকত না,—কেউ আজ অতীতের কথা ভেবে চোখের জলও ফেলত না। সে জিনিসটা মনের অতল তলে চাপা থাকে। ওপরে হয় তো অনেক প্রলেপ পড়ে, কিন্তু হাজার প্রলেপ দিলেও ভেতরের সে জিনিস বিলীন হয় না। এই দেখ না—আমরা সবাই ভেবেছিলুম দাদা সে সব ভুলে গেছে। হয় তো দীর্ঘকালের অদর্শনে, মনে হয়েছিল, দাদা নন্দাকে ভুলে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য্য দেখ—যেই নন্দাকে দেখা—অমনি সব ঘুচে গিয়ে মনের মধ্যে জেগে উঠল একমাত্র নন্দাই। সেখানে আর কেউ নেই,—না তুমি, না দাদার আজকালের প্রিয়তমা চন্দ্রা—"

রমা প্রচুর হাসিতে লাগিল।

কল্যাণী হাসিল না, মুখখানা বড় গম্ভীর করিয়া সে, অদূরে একটা গাছের সরু ডালে বসিয়া যে ছোট পাখীটা কত রকম ভঙ্গী করিয়া নাচিতেছিল, তাহারই পানে তাকাইয়া রহিল।

রমা বলিল, "দেখ না, নন্দা এসেই—আর কাউকে না—একেবারে দাদাকেই দিলে খবর। আর দাদা আমার সব ফেলে ভোঁ করে ছুটল তার কাছে। এ কয়টা দিন তাঁর চুলের আগা দেখতে পেয়েছ কি বউ-দি ?"

শুষ্ক হাসিয়া কল্যাণী বলিল, "হ্যাঁ, নেহাৎ স্বামীর কর্ত্তব্য পালন করতে স্ত্রীকে পাহারা দিতে, রাত এগারটায় এসে, কয়েক ঘণ্টা নাক কান বুজে থেকে, ভোর পাঁচটা হতে না হতে চলে যান।"

রমা বলিল, "তা বুঝেছি।"

একটু সময় চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "দাদা অন্ততঃ পক্ষে একবারও তোমায় বলবেন তিনি পুরী যাচ্ছেন। আমার কথা যদি শুনতে চাও—তাঁকে কিছুতেই যেতে দিয়ো না, তাতে তোমারই ভালো হবে। এখনও যদি ধরে রাখতে পারো! একবার এ বাঁধন কাটলে আর বাঁধন দিতে পারবে না—এ কথা ঠিক জেনে রেখো।"

কল্যাণী একটু হাসিল, আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "যে নিজেই পালাতে চায় তাকে কেউ ধরে রাখতে পারে ভাই? যে পিছল পথে পা দিয়ে নেমে চলেছে—সে সেই পিছলে যাওয়ার আরামটুকু ত্যাগ করতে চায় না এই যা দুঃখ।"

সে নিস্তব্ধ হইয়া সামনের দিকে তাকাইয়া রহিল।

৭

সাত বৎসর পূর্ব্বেকার কথা, যেদিন বিশ্বপতি সত্যই নন্দাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল।

নন্দা রাখাল মিত্রের একমাত্র কন্যা। নন্দা ও বিশ্বপতি পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসিত,—তথাপি রাখাল মিত্র ইহাদের বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই।

বিশ্বপতি শিক্ষিত নহে, তাহার অবস্থাও ভালো ছিল না। এরূপ পাত্র রাখাল মিত্র একমাত্র কন্যার জন্য নির্ব্বাচন করিতে পারেন নাই।

ব্যাপারটা যখন অনেক দূর গড়াইয়া গিয়াছিল, তখন অবস্থা গুরুতর দেখিয়া তিনি গ্রামের বাস তুলিয়া দিয়া, স্ত্রী-কন্যা লইয়া কলিকাতায় চলিয়া যান। তাহার পর হইতে বিশ্বপতির মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছিল। ইহার পর নিতান্ত বাধ্য হইয়া কেবল মায়ের জিদে পড়িয়াই সে কল্যাণীকে বিবাহ করিয়াছিল।

মধ্যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল নন্দার বিবাহ হইয়া গেছে। তাহার পর এই দীর্ঘ সাত বৎসর পরে আবার উভয়ের দেখা হইয়াছে।

নন্দা প্রস্তাব করিল, "আমাদের সঙ্গে পুরী চল না বিশু-দা। যে চেহারা হয়েছে, এখানে থাকলে আর যে বাঁচতে হবে না তা বেশ বুঝছি। আমরা ওখানে দু-তিন মাস থাকব। তুমিও যদি এই মাস দু-তিন ওখানে থাক, তোমার স্বাস্থ্য আবার ফিরে আসবে।"

বিশ্বপতি প্রথমটায় কোন উত্তরই দিতে পারে নাই। ধনীর গৃহের বধূ নন্দা বাল্যসঙ্গী বিশুদাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়াই তাহার

বিশ্বাস ছিল। নন্দা দশ দিনের জন্য দেশের মাটীতে পা দিয়া আগেই যখন বিশুদাকে ডাকিয়া পাঠাইল, তখন, আনন্দে কি বিস্ময়ে কে জানে, কি একটা ভাবে তাহার সারা অন্তর পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া নন্দার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল।

নন্দা বিস্ময়ে খানিক তাহার পানে তাকাইয়া থাকিয়া, তাহার পর হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিয়াছিল, "বউ যত্ন করে না বুঝি,—খেতেও দেয় না?"

প্রথমেই এই প্রশ্ন শুনিয়া বিশ্বপতি তাহার বড় বড় চোখ দুইটী বিস্ফারিত করিয়া নির্ব্বাকে শুধু তাহার পানে তাকাইয়া ছিল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "যত্ন করে না, খেতে দেয় না—কি করে জানলে?"

স্পষ্টবাদিনী নন্দা উত্তর দিয়াছিল, "তোমার চেহারা দেখে। সাত বছর আগে যে বিশুদাকে দেখে গিয়েছিলুম তার সঙ্গে তোমার চেহারার এতটুকু মিল নেই। তাতেই বুঝতে পারছি—যত্ন কেউ করে না, খেতেও পাও না।"

বিশ্বপতি মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিল, "সে বেচারাকে সে দোষ দিয়ো না নন্দা, সে আমায় যত্নও করে, যা পায় খেতেও দেয়। গরীবের ঘরে রাবড়ী পোলাও তো জোটে না, শাক ভাতই খেতে হয়। চেয়ারা যদি ভালো থাকবার হতো ওতেই থাকত,—সে জন্যে তাকে দোষ দেওয়া চলে না। নিজের দোষে নিজের চেহারা নষ্ট করেছি, বউয়ের কোন দোষ নেই। বরং, এ কথা জোর করে বলতে পারি—সে আমায় এত যত্ন করে—হয় তো অনেক স্বামী স্ত্রীর কাছে এমন যত্ন পায় না।"

নন্দার মুখখানা নিমেষে মলিন হইয়া গিয়াছিল। তাহার পরই সে হাসিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিল, "উঃ, তুমি যে বউয়ের প্রশংসায় একেবারে

পঞ্চমুখ হয়ে উঠলে বিশুদা। কিন্তু সত্যি করে বল দেখি, বউয়ে যত্ন করবে না তো কি পরে এসে যত্ন করবে? বউয়ের কর্ত্তব্যই যে স্বামীকে যত্ন করা, সেবা করা।"

সেদিন এইখানেই কথাবার্ত্তা শেষ হইয়া গেল।

দু'দিন থাকিতে থাকিতে নন্দা লোকের মুখে শুনিতে পাইল, বিশ্বপতি নিজেই তাহার স্বাস্থ্য ও চরিত্র নষ্ট করিবার জন্য দায়ী,—সত্যই বেচারা বউটীর উপর এ জন্য দোষারোপ করা চলে না আজ ছয় সাত বৎসর সে অধঃপাতে গিয়াছে। তাহাকে সৎপথে ফিরাইবার জন্য কল্যাণী বড় কম চেষ্টা করে নাই, কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেছে।

ছয় সাত বৎসর!—নন্দা যেন চমকাইয়া উঠিয়াছিল। কোন্ সেই একটী দিনের অতীত স্মৃতি তাহার মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে গোপনে সে চোখের জল মুছিয়াছিল।

সে গোপনে বিশেষ ভাবে সন্ধান লইয়া জানিল, বিশুদার স্ত্রী নেহাৎ ভালো মানুষ। নহিলে এত দিন হয় তো স্বামীকে ফিরাইতে পারিত। চন্দ্রাকে লইয়া যে কেলেঙ্কারী কাণ্ড চলিয়াছে, সে কথাটাও নন্দার নিকট গোপন রহিল না। বিশুদার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া নন্দা সত্যই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

বিশ্বপতিকে পুরীতে লইয়া যাইবার কথা সে যখন আবার বলিল, তখন বিশ্বপতি মাথা চুলকাইয়া বলিল, "সে কি করে হবে নন্দা, দুই একদিন নয়, একেবারে কয়েক মাসের জন্যে যাওয়া—"

নন্দা রাগ করিল, বলিল, "ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয় বিশুদা,—তোমারই বা যাওয়া না হবে কেন? তোমার এমন কি বিষয়-সম্পত্তি আছে যা তুমি না থাকলে একেবারে লাটে উঠবে? সম্পত্তির মধ্যে তো

ওই কয়েক বিঘা জমী। সেও তো একজনের হাতে দিয়ে রেখেছ। কাজেই, ওর কথা ভাববার তোমার দরকার নেই। ও সব বাজে কথা রেখে দাও বিশুদা। আর সকলকে ওই সব যা তা কথা বলে বুঝাতে পারবে, আমায় পারবে না। তুমি সহজে না যেতে চাও, আমি তোমায় জোর করে নিয়ে যাব,—তোমায় না নিয়ে আমি যাচ্ছি নে।"

নিতান্ত নিরুপায় ভাবেই বিশ্বপতি বলিল, "বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্যেই যে যেতে পারছিনে তা নয় নন্দা, যেতে আমারও খুব ইচ্ছে আছে। তবে কি জানো—রাঙাবউ একেবারে একা থাকবে, ওকে দেখতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। একা মেয়ে মানুষ কি করে থাকবে, কেই বা ওকে দেখাশুনা করবে, আমি কেবল তাই ভাবছি।"

নন্দা অকস্মাৎ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "থাক, অতটা ভালোবাসা আর নাই দেখালে বিশুদা, তবু যদি আমার কিছু শুনতে বাকি থাকত। এই যে শুনতে পাচ্ছি তুমি অনেক রাতই বাড়ী থাক না, মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন তুমি বাড়ীতে থাও না,—সে সব দিন-রাতগুলো কেমন করে তার কেটে গেছে সেটা ভেবে দেখেছ কোন দিন?"

বিশ্বপতি যেন সচেতন হইয়া উঠিল,—"কি রকম? এ সব কথা তুমি কোথা হতে শুনলে বল দেখি, কে বললে?"

নন্দা বলিল, "শুনেই বা লাভ কি? নাম করব কার, গাঁয়ের লোক সবাই এই এক কথাই বলছে। এখানে তুমি থাকলেও বউ যেমন থাকে, তুমি চলে গেলেও ঠিক তেমনি থাকবে। বরং পতিব্রতা মেয়েদের মত মনে করে শান্তি পাবে—সে কষ্ট পাক দুঃখ পাক—তার স্বামী তো ভালো আছে, তার স্বাস্থ্য তো ভাল আছে।"

বিশ্বপতি একটু হাসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু হাসি ফুটিল না, মুখখানাই

কেবলমাত্র বিকৃত হইয়া উঠিল। সে বলিল, "থাক, আর বলতে হবে না নন্দা, আমি তোমার সঙ্গেই যাব। তুমি কবে যাচ্ছো বল দেখি?"

নন্দা মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "আজই রাত্রে রওনা হওয়ার জন্যে তাগাদা এসেছে। উনি হাওড়ায় এসে থাকবেন, আমরা এদিক হতে যাব, এই ব্যবস্থা করে পত্র দিয়েছেন। তুমি তা হলে আর দেরী করো না, বউকে দেখবার শোনবার জন্যে কাউকে ঠিক করে দিয়ে তোমার যা জিনিসপত্র নিয়ে এসো।"

বিশ্বপতি তথাপি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কি,—আর কোন কথাবার্ত্তা আছে না কি?"

বিশ্বপতি মাথা নাড়িল।

নন্দা বলিল, "বুঝেছি, তোমার এ গাঁ ছেড়ে যেতে মন সরছে না। বলি, বউয়ের ওপর তো এতটুকু মায়াদয়া নেই শুনেছি, তবে কিসের মায়ায় যেতে চাচ্ছো না শুনি?"

বিশ্বপতি হাসিল, বলিল, "কি যে বল নন্দা—" সে হাসিল বটে, কিন্তু তাহার হাসিতে একটুকুও জোর ছিল না।

নন্দা বলিল, "তা হলে যাও, আর দেরী করো না। সনাতনকে বলে এসো—তুমি যে তিন মাস পুরীতে থাকবে, এই তিন মাস যেন সে তোমার বাড়ী, বউ চৌকী দেয়। তোমার বউকেও বেশ করে বুঝিয়ে বলে এসো—তোমার কোন ভয় নেই, এতে তোমার ভালোই হবে। আর যাওয়ার সময় বাগ্দি পাড়াটা ঘুরে যেয়ো একবার। ওদেরও তো একবার জানানো দরকার, নইলে সে বেচারারাই বা কি ভাববে।"

তাহার শ্লেষপূর্ণ কথাটা বিশ্বপতির বুকে বড় বেশী রকমই আঘাত

দিল, তাহার সুগৌর মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল। সে উষ্ণ স্বরে বলিল, "সেই সঙ্গে এ খবরটা তোমার পাওয়া উচিত ছিল নন্দা,—বাগ্দি পাড়ায় যাকে খবর দেব সে নেই,—আজ কয়দিন হল তোমারই কাকার সঙ্গে কলকাতায় চলে গেছে।"

নন্দা যেন আরামের একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তাই না কি,—বাঁচলুম। আমার কাকার সঙ্গে সে যেখানে খুসি যাক, আমার তাতে এতটুকু আপত্তি নেই; কারণ, আমার কাকা বিপত্নীক, উনি গেলে ওঁর পেছনে কাঁদতে কেউ নেই। তিনি অধঃপাতে গেলেও কারও কিছু আসবে না যাবে না, ক্ষতি বৃদ্ধি তাতে কারও নেই। তোমার অধঃপাতে যাওয়ার সঙ্গে আমার কাকার অধঃপাতে যাওয়ার ঢের তফাৎ আছে সেটা ভেবে দেখো। যাক, তোমার ঘাড় হতে যে পেত্নী নেমে গেছে, এর জন্যে আমি হরিলুট দেব।"

বিশ্বপতি মলিন হাসিয়া বাহির হইয়া গেল।

পথেই সনাতনের সঙ্গে দেখা। বিশ্বপতি তাহাকে জানাইল, সে মাস দুই তিনের জন্য পুরী যাইতেছে। এই দুই তিন মাস সনাতনকে তাহার বাড়ী দেখাশুনা করিতে হইবে।

সনাতন জিজ্ঞাসা করিল, "হঠাৎ যে পুরী চললেন, মানে?"

বিশ্বপতি উত্তর দিল, "মানে আর কি? ওরা যাচ্ছে, দয়া করে সঙ্গে নিচ্ছে,—ভাবলুম পরের দয়ায় এই সুযোগে যদি জগন্নাথ দর্শনটা হয়ে যায় যাক না। বাড়ীর ভার কিন্তু তোমারই ওপরে থাকল সনাতন! সব যেন ঠিক থাকে দেখো। তোমার মা-লক্ষ্মীকে দেখাশোনা—"

সনাতন একটু হাসিল, বলিল, "সে কথা আমায় আর বলতে হবে না দা-ঠাকুর। এই যে প্রায়ই রাতে তুমি বাড়ী থাক না,—মা-লক্ষ্মী একা কি

ওই বাড়ীতে থাকতে পারে,—কাজেই এই বুড়োকেই গিয়ে পাহারা দিতে হয়। যাক, কপালে যখন জুটল, ঠাকুর দর্শন করে এসো, আমি ওঁকে দেখাশোনা করব।"

নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্বপতি বাড়ী আসিল।

"কই গো রাঙাবউ, কোথায় গেলে? বাক্সের চাবিটা একবার দাও দেখি, বিশেষ দরকার।"

কল্যাণী রন্ধনগৃহ পরিষ্কার করিতেছিল, হাত ধুইয়া অঞ্চল হইতে চাবি খুলিয়া স্বামীর সামনে ফেলিয়া দিল।

বিশ্বপতি তাড়াতাড়ি বাক্স খুলিয়া কাপড় জামা বাছিতে লাগিল।

পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিল কল্যাণী, শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "পুরী যাচ্ছো, ফিরবে কবে?"

বিস্মিত ভাবে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বিশ্বপতি জিজ্ঞাসা করিল, "জানলে কি করে?"

চোখ দুইটী জ্বালা করিতেছিল, তবু কল্যাণী হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "খবরটা আমায় কোন রকমে না জানানোই ইচ্ছে, তা আমি জানি। সারা গাঁয়ের লোক জানতে পারলে, আমি জানতে পারব না? যাক, ফিরছ কবে, এখানকার কি ব্যবস্থা করে রেখে যাচ্ছো?"

বিশ্বপতি বলিল, "ফিরতে বোধ হয় মাস দুই তিন দেরী হবে। এখানকার ব্যবস্থা ঠিক করেছি। সনাতন রয়েছে, তোমার কিছুমাত্র ভাবনা করতে হবে না। আমি হয় তো এর মধ্যেও ফিরে আসতে পারি। মহাপাপী লোক, শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে কি মন টিঁকে থাকবে? ওই জন্যেই না কোথাও যেতে পারিনে, গেলেও একদিনের বেশী দু'দিন থাকতে পারিনে।"

কথাগুলি বলিয়া সে প্রচুর হাসিতে লাগিল। তাহার সে হাসিতে কল্যাণীর গম্ভীর মুখখানা আরও গম্ভীর হইয়া উঠিল মাত্র।

ছোট সুট-কেসটার মধ্যে দু'খানা কাপড় জামা গুছাইয়া লইয়া বিশ্বপতি উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, "তা হলে এখনই চললুম রাঙা-বউ, ওদের ওখানেই খাওয়া দাওয়া হবে, নন্দা বলে দিয়েছে। সনাতন সন্ধ্যেবেলাই আসবে এখন, তোমার কোন ভয় ভাবনা নেই। নিশ্চিন্ত হয়ে থেকো, নিজের শরীরের দিকে নজর রেখো—বুঝলে ?"

দুঃখের আবেগে কল্যাণীর সমস্ত অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছিল। নিষ্ঠুর —বড় নিষ্ঠুর। সংসারী সে, তাহার সবই তো আছে, কাহার ডাকে সে একটী মুহূর্ত্তে বাড়ী ঘর, স্ত্রী সব পিছনে ফেলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে ! সে কে ? সে তাহাকে কতখানি দিয়াছে ?

আর কল্যাণী, সে স্বামীকে সর্ব্বস্ব দিয়া দাসীরও অধম হইয়া, কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া রহিয়াছে ! তাহার কথা বিশ্বপতি একটীবার মনে করিল না, তাহার কষ্টের পানে একটীবার চোখ তুলিয়া চাহিল না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কল্যাণী ভাবিল স্বামীর হৃদয়ে তাহার স্থান কোথায় ? বিবাহ দুইটী মানুষকে একত্র করে, তাহাদের জীবন সুখময় করে বলিয়া যাহারা বিশ্বাস করে, তাহাদের সে ধারণা ভুল। বিশ্বপতির হৃদয় অন্যের অধিকৃত, সেখানে বিবাহিতা পত্নীর স্থান কোথায় ?

স্বামীর পিছনে চলিতে চলিতে আর্দ্রকণ্ঠে সে বলিল, "তোমার শরীর মোটেই ভালো নয়, মাঝে মাঝে পত্র দিয়ে জানাতে পারবে কি কেমন আছ ?"

চলিতে চলিতে বিশ্বপতি হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইল। মুখখানা নত করিয়া

পত্নীর মুখের পানে তাকাইয়া দেখিল, তাহার বড় বড় দুইটী চোখে জল টল টল করিতেছে।

কি মনে করিয়া সে চট করিয়া হাতখানা কল্যাণীর স্কন্ধে রাখিল। মুখখানা নত করিতেই কল্যাণীর ললাটে ঠেকিল। তখনই চমকাইয়া উঠিয়া দুই পা পিছনে সরিয়া গিয়া সে বলিল, "দেব বই কি, তুমিও দিয়ো।"

সে দ্রুতপদে চলিয়া যাইতে যাইতে একবার পিছন পানে তাকাইয়া দেখিল, কল্যাণী আড়ষ্ট ভাবে সেইখানেই দাঁড়াইয়া তাহার পানে তাকাইয়া আছে,—তাহার চক্ষু দিয়া নিঃশব্দে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতেছে।

আনন্দপূর্ণ মনটা কি জানি কেন বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

বড় দুঃখেও মানুষের হাসি আসে।

তাই প্রথম যেদিন নিশীথ রাত্রে বাড়ীর উঠানে কোথা হইতে গোটা-কত ইঁট আসিয়া পড়িল, সেদিন কল্যাণী না হাসিয়া থাকিতে পারে নাই।

সনাতন ঘুম ভাঙ্গিয়াই লাঠি হাতে ছুটিয়াছিল। কিন্তু যাহারা ঢিল ছুঁড়িয়াছিল, তাহারা, তাহার যথাস্থানে পৌঁছিবার অনেক আগেই, অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া নিষ্ফল আক্রোশে ফুলিতে ফুলিতে সনাতন বলিল, "বুঝেছ মা-লক্ষ্মী, এ সব এই গাঁয়ের বদ ছোঁড়াদের কাজ। কেবল ওরা কেন, গাঁয়ের অনেক লোকই জানে দা'ঠাকুর পুরী গেছে, দুই তিন মাস বাড়ী আসবে না। ভাবছে—এই সময়ে একবার বীরত্ব দেখিয়ে নেওয়া যাক।"

কল্যাণী হাসিতেই সে একেবারে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তীব্রস্বরে বলিল, "না, তুমি হেসো না মা, ওতে ছোটলোকগুলা প্রশ্রয় পেয়ে যায়। এটা হাসির কাজও নয়, কথাও নয়। আমি এর উপায় করব তবে আমার নাম সনাতন দাস। কালই আমি এই সব বদ ছোঁড়াদের দেখে নেব। এই পাকা বাঁশের লাঠির ঘায়ে এক একটাকে কাবার করে দেব, জানাব,—সনাতন দাস বুড়ো হলেও তার বুকে সাহস আছে, হাতে জোর আছে।"

বাঁশের লাঠিটা সে দু-চারবার খুব জোরে মাটিতে আছড়াইল।

কথাটা শুনিয়া হাসি পায়। কিন্তু হাসিলে পাছে সনাতন আবার

অতিরিক্ত রকম চটিয়া উঠে, তাই কল্যাণী হাসি সামলাইয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "বুঝলুম তো সবই, কিন্তু কথা হচ্ছে কি—প্রকৃত দোষীকে পাবে তবে তো তাকে লাঠির ঘায়ে কাবার করবে। সত্যি, গাঁয়ে যত ছেলে আছে সবাই কিছু দোষী নয়,—আমার বাড়ী ঢিল ফেলতে সবাই আসে নি। ওদের মধ্যে দু-চারজন হয় তো এ কাজ করেছে, তুমি তাদের ধরবে কি করে?"

সনাতন ভাবিয়া দেখিল কথাটা সত্য। নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া সে বলিল, "তাই তো! তবে?"

কল্যাণী বলিল, "একেবারে হাতে হাতে না ধরলে কিছুই করতে পারবে না। সন্দেহ করে তুমি ধরবে কাকে, লাঠি মারবে কার মাথায়?"

ইহার পর দুই তিন দিন সনাতন জাগিয়া পাহারা দিল। সে কয়দিন কোন উৎপাত হইল না, কাহারও সাড়া পাওয়া গেল না।

ঘাটে নরেনের স্ত্রী চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের বাড়ী না কি ঢিল পড়েছে ভাই?"

কল্যাণী গম্ভীর মুখে উত্তর দিল, "কই—না।"

সে বেচারা থতমত খাইয়া গেল।

সেদিন দুপুরে বেড়াইতে আসিয়া কাত্যায়নী বলিলেন, "কাজটা ভালো করনি বউ-মা,—ছেলেটাকে ওদের সঙ্গে কখনও পাঠাতে হয়? এই সামনে রথ আসছে,—লাখ লাখ যাত্রী সেখানে যাবে,—আর কি মড়কই না সেখানে ধরবে। এ সময় না কি কেউ কাউকে পুরীতে পাঠায়?"

শান্ত সুরেই কল্যাণী বলিল, "রথের সময়েই তো সকলে পুরী যায় জ্যেঠাইমা।"

জ্যেঠাইমা হাত নাড়িয়া বলিলেন, "তুমি আর বলো না বাছা। রথের সময় পুরীতে যায় কারা, যাদের আপনার বলতে কেউ নেই, কিম্বা যাদের পাঁচটা ছেলে-পুলে আছে, নিজে গেলে বংশধ্বংস হবে না, তারাই যায়। বিশুর মত কয়টা ছেলে পুরী যায় বল দেখি?"

কল্যাণী বলিল, "ওঁরাও তো গেছেন, ওই নন্দা, তার মা, স্বামী—"

বিকৃত মুখে কাত্যায়নী বলিলেন, "জামাই কি সেখানে আছে গো, সে তো চলে এসেছে শুনেছি। সে হচ্ছে কাজের লোক, সে কি ওখানে বসে থাকতে পারে? আর নন্দা, মিত্রগিন্নির কথা বলছ,—ওরা মেয়েমানুষ, দুনিয়ার জঞ্জাল, ওরা সহজে মরছে না, সে তুমি ঠিক দেখে রেখো। পুরুষ যত মরে হতভাগী মেয়েগুলো সে রকম মরে কি? মেয়েদের আমাদের দেশে যত বেশী দেখতে পাওয়া যায়, পুরুষ অত কই?"

কল্যাণী ইহার উত্তর দিতে গিয়া হঠাৎ নিজেকে সামলাইয়া লইল, দরকার নাই অনর্থক বিবাদে।

কাত্যায়নী বলিলেন, "তুমি বাছা আজকালকার মেয়ে হলেও স্বামীকে যে কি করে ঘরে আটক করে রাখতে হয় তা জানো না। বলি, তুমি যদি সে রকম মেয়ে হতে তা হলে কি বিশু আজ কোথায় হাড়ি-বাড়ী, বাগ্দি-বাড়ী, মুচি-বাড়ী ঘুরে বেড়াত, না এই নন্দার একটী কথায় ঘর পরিবার ফেলে এমনি করে দূর বিদেশে যেতে পারত? স্বামীকে ভালোর পথে আনা দূরে থাক, ওকে অধঃপাতের পথে আরও এগিয়ে তুমিই দিলে বাছা। নন্দার কথা দেশে জানে না কে? আগে তবু নরম-সরম ছিল, কথা বললে শুনতো, এখন একটা কথা বলতে গেলে সে দশটা কথা শুনিয়ে দেয়। ওই সেদিনে বললুম 'বাছা, নিজে যাবি যা, পরের ছেলেটাকে আরও অধঃপাতে দিতে আর কেন নিয়ে যাচ্ছিস, ওকে ছেড়ে দে।'

তাতে হেসে বললে কি—'মার চেঁয়ে দরদী যে তাকে বলে ডান' তোমার নিজের চরকায় তেল দাও গে, আমার দিকে তাকিয়ে তোমায় মাথা গরম করতে হবে না।' শুনলে মা কথাগুলো? ও না হয় বড়লোকের মেয়েই হলো, বড় ঘরে না হয় বিয়েই হয়েছে। তা বলে এত দেমাক, এত অহঙ্কার, এ কি ধর্ম্মে সইবে?"

কল্যাণীর মুখে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল।

সমস্ত দিনটা তবু যেমন-তেমন করিয়া কাটিয়া যায়,—রাত্রি হইলেই বিশ্বের ভাবনা সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসে। বারাণ্ডায় পড়িয়া সনাতন দিব্য নাক ডাকাইয়া ঘুমায়, ঘরের মধ্যে কল্যাণী ছটফট করে।

আজ প্রায় এক মাস হইল বিশ্বপতি চলিয়া গেছে, এ পর্য্যন্ত একখানি পৌঁছা সংবাদ পর্য্যন্ত দেয় নাই। মানুষ এমনই করিয়া কি সব ভুলিয়া যায়,—কেবল সম্মুখ পানেই ছুটে, পিছন পানে ফিরিয়া চায় না?

সময় সময় মন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। স্বামী স্ফূর্ত্তির জন্য চলিয়া গেছে,—আর সে তাহার স্মৃতিটুকু সম্বল করিয়া তাহার ভিটায় বাস করিবে কেন? কেবল বিবাহের দাবীটাই কি বড় হইল, সেই বন্ধনটাই শ্রেষ্ঠ, তাহারই বলে পুরুষ যত কিছু অত্যাচার অনাচার করিয়া যাইবে? অন্তরের বন্ধন যেখানে নাই, উপরের এই আলগা বন্ধন সেখানে কতক্ষণ অটুট হইয়া থাকিবে?

পাড়ার ছেলেগুলিও যেন বিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এতদিন বিশ্বপতি থাকিতে ইহারা কখনও চোখ তুলিয়া কল্যাণীর পানে তাকায় নাই, আজ বিশ্বপতি চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের চোখ কল্যাণীর উপর পড়িল।

অথচ এমন কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না, যাহা উপলক্ষ করিয়া তাহাদের বেশ দুইটা কড়া কথা শুনাইয়া দেওয়া যায়, অথবা সনাতনকে বলিয়া দিতে পারা যায়। তাহারা বাড়ীর পাশ দিয়া অশ্রাব্য গান গাহিয়া চলিয়া যায়, কল্যাণী নীরবে শুনিয়া যায়, কথা বলিতে পারে না।

একদিন সনাতন নিজের কানে শুনিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল। ছেলেরাও জবাব দিয়াছিল—"তুমি চুপ করে থাকো সনাতন! আমরা পথ দিয়ে গান গেয়ে যাই, তাতে তোমাদের কিছু আসে যায় না। না শুনতে পারো, কান বন্ধ করে রাখ—ফুরিয়ে গেল।"

নিমাই ছেলেটী বরাবর এ বাড়ীতে যাওয়া-আসা করিত,—বিশ্বপতিকে সে দাদা বলিয়া ডাকিত,—এবং সেই জন্যই কল্যাণীকে সে বউদি বলিয়া ডাকিত। কল্যাণী কখনও তাহার সহিত কথা বলে নাই, অনেক সময় লুকাইয়া থাকিত।

বিশ্বপতির মনটা ছিল সাদা, সে স্ত্রীকে বলিত, "নিমাইকে দেখে অতটা লজ্জা করো না রাঙাবউ,—ওর মত পরোপকারী ছেলে পাওয়া দুর্ঘট। যে সব ছেলেরা বদমায়েসী করে ফেরে, নিমাই তাদের দলের নয়, এ আমি শপথ করে বলতে পারি।"

তথাপি কল্যাণী অবগুণ্ঠন খুলে নাই, কথাও বলে নাই। এই নিমাইয়ের মধ্যে সে কোন দিনই সন্দেহের লক্ষণ দেখিতে পায় নাই। এবার যেন তাহার একটু সন্দেহ হইল।

মাঝে কয়দিন সনাতনের জ্বর হইয়াছিল, তখন নিমাই অনবরত যাওয়া-আসা করিত, তদারক করিত, ঔষধ আনিয়া খাওয়াইত। ইহাতে কল্যাণী সত্যই যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছিল, কৃতজ্ঞও হইয়াছিল বড় কম নয়।

স্বামী থাকিতে সে কাহাকেও কোন দিন সন্দেহ করে নাই। এইবার প্রথম তাহার মনে হইল—না ডাকিতে নিমাই কেন আসিয়া সনাতনের শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিল?

আজকাল বাধ্য হইয়াই অবগুণ্ঠন খুলিতে হইয়াছে; তবু সে বড়-একটা কথা বলিতে চায় না।

নিমাই আজকাল অনেক জিনিষ আনিয়া দিতে সুরু করিয়াছে। প্রায়ই মাছ তরকারী চাকরের হাতে দিয়া পাঠাইয়া দেয়। সঙ্কুচিতা কল্যাণী একদিন সনাতনকে মাঝে রাখিয়া নিমাইকে শুনাইয়া বলিল, "নিমাইঠাকুরপোকে বলে দাও সনাতন, আমি একলা মানুষ, এত মাছ তরকারীতে আমার কিছুমাত্র দরকার নেই। আমার যেমন করে দিন চলছে এমনই চলবে, এ সব দেওয়ার দরকার নেই।"

এই সোজা কথাটাতেও নিমাই রাগ করিল, দুঃখ পাইল; বলিল, "এ অন্যায় কথা বউদি, সত্যি করে বল দেখি, বিশুদা থাকতেও কি আমি জিনিসপত্র দিতুম না? আমি তো পয়সা দিয়ে কিনে কিছু দিচ্ছিনে, পুকুরের মাছ, বাগানের তরকারী পাঠিয়ে দেই। বরাবরই তো দিয়ে আসছি কই,—বউদি তো কখনও কোন আপত্তি করেন নি, আজই যত আপত্তি তুলছেন।"

কল্যাণী একেবারেই এতটুকু হইয়া গেল। ইহার পর সে আর এ সম্বন্ধে একটী কথাও বলিতে পারে নাই।

নিমাই এ দেশের ছেলেদের নিন্দা করিত। এই সব ছেলেরা না পারে এমন কোন কাজ নাই। তা না হইবেই বা কেন? ইহারা কি শিক্ষা পাইয়াছে,—মেয়েদের যে সম্মানের চোখে দেখিতে হয়, তা কি ইহারা জানে? জন্ম হইতে এই দেশেই পড়িয়া আছে,—মেয়েদের ছোটবেলা

হইতে নিতান্ত হেলার চোখেই দেখিয়া থাকে,—ভোগের বস্তু বলিয়া মনে করিয়া যায়।

নিমাই নিজে জীবনের বাইশটা বৎসর কলিকাতায় কাটাইয়া আজ মাত্র তিন বৎসর গ্রামে আসিয়া রহিয়াছে। গ্রামের ছেলেদের মধ্যে কাহারও সঙ্গে এখনও তাহার সম্প্রাতি হয় নাই। সে বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। কাজেই, শিক্ষার গর্ব্ব তাহার মধ্যে বেশই আছে।

বলা বাহুল্য, নিমাই শীঘ্রই বেশ জাঁকাইয়া বসিল। কল্যাণী ধারণায় আনিতে পারিল না—বাইশটা বৎসর কলিকাতায় কাটাইয়া এবং বি-এ পর্য্যন্ত পড়িয়া নিমাইয়ের মন আজও তেমন হইতে পারে নাই যাহাতে মেয়েদের মা-বোন ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না। মুখে সে মেয়েদের মায়ের জাতি বলিয়া চরম সম্মান দেখাইলেও, অন্তরে তাহার অনেকখানি গলদ রহিয়া গেছে, এবং সেও মেয়েদের ভোগের বস্তু বলিয়াই মনে করে।

বাঘ কখনই নিজের স্বভাব ছাড়িতে পারে না। সে যতই ছদ্মবেশে থাক, ধার্ম্মিকের ভান করুক, উদর পূর্ণ করিয়া আহার করুক,—সময় পাইলেই সে শিকারের উপর লাফাইয়া পড়িবেই। গায়ের উপর মেষের আচ্ছাদন দিলেও সে মেষ হয় না,—তাহার মধ্যে হিংস্র জন্তুটী সর্ব্বদার জন্য সচেতন হইয়াই থাকে। লাভের মধ্যে এই হয়—বাঘকে নিজ বেশে দেখিলে লোকে সাবধান হইতে পারে; কিন্তু মেষচর্ম্মাবৃত বাঘকে দেখিয়া কেহই সাবধান হইতে পারে না,—সেও নিজের ইচ্ছানুসারে নিজের হিংস্র প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া যায় মাত্র।

৮

ভাদ্রমাসের শেষে হঠাৎ একদিন সনাতনের মুখে কল্যাণী সংবাদ পাইল—বিশ্বপতির বড় অসুখ, তাহার না কি বাঁচিবার আশা নাই।

কল্যাণী কাঁদিবে না ভাবিয়াছিল, কিন্তু কোথা হইতে অজস্র চোখের জল অবাধ্য গতিতে নামিয়া আসিয়া তাহার বুক ভাসাইয়া দিয়া গেল।

মনে হইল—সে যাহাই করুক, যাহাই হোক, তবু সে কল্যাণীর স্বামী। আবার শুধু স্বামী হইলেই হইত না, কল্যাণী তাহাকে ভালোবাসে। স্বামীর ঠিকানা সে পাইয়াছিল, নিতান্ত রাগ করিয়াই সেও তাহাকে পত্র দেয় নাই। সে রাগটাও তো নিরর্থক নয়। তাহারও কি সেখানে পৌঁছাইয়া অন্ততঃপক্ষে একখানা পত্র দেওয়া উচিত ছিল না? সেই জ্যৈষ্ঠ মাসে সে গিয়াছে, ভাদ্রও প্রায় শেষ হইয়া আসিল, বাড়ী আসা দূরে থাক, একখানি পত্রও লেখার সময় তাহার হয় নাই।

কত দিন নিস্তব্ধ ঘরে বিছানায় শুইয়া পড়িয়া সে নির্জ্জলচক্ষে মনে মনে বলিয়াছে—এই কি ভালো কাজ? কত দিন সে অন্যমনস্ক ভাবে গুন গুন করিয়া গান গাহিয়াছে—

"সে কোথায় দূর বিদেশে হেসে কাটায় মধুরাতি
হেথা যে বুকে আমার জ্বলে মরে আশা বাতি—
ভুলেছে সে,—তবু কেন তারে বাঁধি?"

পুঞ্জীভূত সকল রাগ দুঃখ অভিমান এই একটী সংবাদে আজ দূর হইয়া গেল। সে কি করিবে ভাবিয়া ঠিক করিতে না পারিয়া আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল।

সেখানে কে তাহাকে তেমন করিয়া দেখিবে? কল্যাণী যেমন ভাবে তাহার সেবাযত্ন করিতে পারিত, নন্দা তেমন করিতে পারিবে কি? না হয় সে বিশ্বপতিকে ভালোবাসে, বিশ্বপতি তাহাকে ভালোবাসে; কিন্তু তবু তাহারা যখন সমাজে বাস করে, সমাজের আইন-কানুন মানিয়া দূরত্ব রক্ষা করিয়া তাহাদের চলিতেই হইবে। এ সময়ে যদি নন্দার স্বামী সেখানে থাকে, নন্দা তো বিশ্বপতির কাছে সর্ব্বদা থাকিতে পারিবে না।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা বিদ্যুৎ-চমকের মত তাহার মনে ভাসিয়া উঠিল। যদি বিশ্বপতির কিছু হয়, যদি সে ইহলোক ত্যাগ করে, যাইবে কার? নন্দার কতটুকু ক্ষতি হইবে? সে যেমন আছে তেমনই থাকিবে, তাহার নাম বাংলার অভাগিনীদের তালিকাভুক্ত হইবে না, সর্ব্বনাশ হইবে যে কল্যাণীর। সে রাগ করুক,—দূরে থাক, তবু কল্যাণী বিশ্বপতিকে ভালোবাসে, তাহার অকল্যাণ কল্পনায় কল্যাণীর অন্তর কাঁপিয়া উঠে।

তাহার সর্ব্বস্ব যায় এ সংবাদ পাইয়া সে এখানে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে কি করিয়া? কিন্তু উপায় কই? সে সেখানে—সেই দূরদেশে যাইবেই বা কি করিয়া?

এতক্ষণ হয় তো সে বিছানায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। তাহার পীড়িত শয্যাপার্শ্বে কেহ নাই, কেহ তাহার মাথার উপর স্নেহপূর্ণ হাতখানি রাখে নাই। কেহ তাহাকে দুইটা সান্ত্বনার কথা বলিতে নাই! সে একা বিছানায় পড়িয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, হয় তো তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। উঃ, এ কল্পনাও যে অসহ্য—কল্যাণী যে আর থাকিতে পারে না।

সন্ধ্যার সময় নিমাই আসিবামাত্র সে তাহার সামনে আসিয়া পড়িল, উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া বলিল, "ঠাকুরপো, এ যাত্রা আমায় বাঁচাও,

আমার ভাইয়ের কাজ কর। আমায় কালই তোমায় পুরী নিয়ে যেতে হবে। ওঁর নাকি সেখানে বড্ড অসুখ, বাঁচবার কোনও আশা নেই।"

আজ এই প্রথম তাঁহার সঙ্কোচহীন কথাবার্ত্তা। বিপদে পড়িলে লজ্জা সঙ্কোচ কিছুই থাকে না।

নিমাই প্রবোধ দিয়া বলিল, "তা না হয় যাব, তার জন্যে তুমি এত কাঁদতে আরম্ভ করেছ কেন বৌদি?"

চোখ মুছিতে মুছিতে কল্যাণী রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "কান্না আসে না? সেখানে কেউ নেই,—কে তাঁকে দেখছে—সেবা করছে বল দেখি?"

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল।

হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া নিমাই বলিল, "ক্ষেপেছ বউদি, সেখানে নন্দা আছে তা জানো? সেবা করবার লোক যদি কেউ না থাকত, তোমায় নিশ্চয়ই যাওয়ার জন্যে খবর দিত। তা যখন দেয় নি, তখন জেনে রাখ, তোমার ও-সব মিথ্যে কল্পনা। নন্দা তাঁকে সে সব কষ্টের আভাসই পেতে দেয় নি এ আমি ঠিক বলছি।"

সোজা কথাটা শুনিয়া কল্যাণী কেমন যেন হতভম্ব হইয়া গেল। তাহার অজ্ঞাতেই কখন তাহার চোখের জল শুকাইয়া গেল।

নিমাই গম্ভীর ভাবে বলিল, "তবু যেতে যখন চাচ্ছ, চল,—এর পর যে বলবে—ঠাকুর-পোকে এত করে বলা সত্ত্বেও সে নিয়ে গেল না—সেটী হবে না, অতবড় অপবাদটা আমি সইতে পারব না। আমি কালই তোমায় নিয়ে রওনা হব, গিয়ে তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাবে বউদি—আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি কি না। গিয়ে দেখতে পাবে, বিশুদা দিব্যি আরামে শুয়ে থেকে নন্দার সেবা নিচ্ছেন, ভূপেনবাবুর চেয়েও সুখ-শান্তিতে আছেন, নন্দা দিনরাত তাঁর পাশেই আছে। তুমি হঠাৎ গিয়ে পড়ে

সেখানে একটা বিপ্লবই বাধিয়ে তুলবে মাত্র, ওঁদের নিরুপদ্রব শান্তি নষ্ট হবে, আর তাতে কেউই তোমার ওপর খুসি হবেন না, তোমার সতীধর্ম্মও সেখানে উপহাস্য হবে—এ আমি তোমায় লিখে দিচ্ছি।"

কল্যাণী মুখখানা অন্ধকার করিয়া বসিয়া রহিল।

নিমাই বলিল, "তা হলে তুমি তোমার কাপড় গুছিয়ে ঠিক করে রেখো, আমি কাল দুপুরের ট্রেনে তোমায় নিয়ে রওনা হব,—কেমন?"

কল্যাণী মাথা নাড়িল, শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "না থাক, আমি যাব না।"

একটু হাসিয়া নিমাই বলিল, "ওই তো তোমাদের মেয়েজাতির দোষ;—শোন যদি একটু কিছু হয়েছে অমনি ফেটে চৌচির হয়ে পড়। রাগ দুঃখ এখন শিকেয় তুলে রেখে দাও; যখন যাব বলেছ তখন চল একবার, নিজের চোখে সব একবার দেখে এসো বিশুদা কি ভাবে দিন কাটাচ্ছে।"

কল্যাণীর মুখখানা ক্রমেই নত হইয়া পড়িল। তাহারই স্বামীর সম্বন্ধে একজন অনাত্মীয় লোক যে এতগুলা কথা বলিল, তাহাতে সে একটী প্রতিবাদও করিতে পারিল না। করিবে কি করিয়া। সত্যই যে তাহার স্বামীর মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা লইয়া তাহার পক্ষ হইয়া দুইটা কথা শুনাইয়া দিতে পারা যায়।

পরদিন নিমাই যখন একেবারে গাড়ী লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সামনে একটী ছোট বাক্সে খানকতক কাপড় সাজাইয়া কল্যাণী স্তব্ধ ভাবে বসিয়া ছিল।

নিমাইকে দেখিয়াই সে বলিয়া উঠিল, "থাক ঠাকুরপো, আমি যাব না।"

নিমাই বলিল, "তা কি হয় বউদি? এখন সব ঠিক করে 'যাব না'

বললে চলে না। আমি বাড়ীতে মাকে বলে এসেছি, গাড়ী পর্য্যন্ত সঙ্গে এনেছি, এখন আর ফিরে যাওয়া চলে না। চল, একবার না হয় চোখে দেখেই আসবে, সঙ্গে সঙ্গে মহাপ্রভুর দর্শনলাভও হবে। তোমাদের শাস্ত্রে মহাপ্রভুর দর্শন মহাপুণ্যের কাজ বলে—না? চল না, একঢিলে না হয় দুই পাখীই মেরে আসবে।"

বলিতে বলিতে সে হাসিতে লাগিল।

মনটা যদিও স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল না, তথাপি কল্যাণী জোর করিয়া হাসিল, বলিল, "আমাদের শাস্ত্রে বলে,—তুমি কি আমাদের শাস্ত্র-ছাড়া লোক?"

নিমাই বলিল, "নিশ্চয়ই। আমি কোন দিনই তোমাদের ওই ছত্রিশ কোটি দেবতাকে মানতে পারি নি, পারবও না। অনেক দিনই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি বউদি, কেউ বশে আনতে পারে নি, আশা করি পারবেও না। এ একটা সৃষ্টিছাড়া লোক বউদি, কোন দিন ধর্ম্ম নামে জিনিষটার ওপর এতটুকু আস্থা হল না, যা শুনি তাইতেই যেন হাসি পায়। সত্যি কথা, ধর্ম্ম জিনিষটার অর্থ কোনদিনই আমি খুঁজে পাই নি। ধর্ম্ম অর্থ যা আমাদের ধারণ করে। তা হলে বলবে, ধর্ম্ম ছাড়লেই আমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এ যেন একটা গাঁজাখোরের কথা— যে ধর্ম্মই আমাদের ধরে আছে। অনেক নাস্তিকও তো আছে যারা ধর্ম্ম জিনিসটাকে মোটেই মানে না। ওরা বেঁচে রইল কি করে বুঝাও।"

কল্যাণী শান্ত কণ্ঠে বলিল, "অত জ্ঞান পাই নি ঠাকুরপো, মোটামুটি জানি—যারা ধর্ম্ম ছাড়ে, জগতে দু'দিনের জন্যে তারা হেসে খেলে দিন কাটিয়ে গেলেও মরণের পরে তাদের নরকে যেতে হবে।"

নিমাই গম্ভীরমুখে বলিল, "ওই দেখ, গোড়াতেই একটা মস্ত বড় গলদ

বাধিয়ে রেখেছ। স্বর্গ, নরক, ইহলোক, পরলোক, জন্মান্তর, এই রকম সব বড় বড় গালভরা নামগুলো মুখস্থ করে রেখেছ,—এগুলো সত্যিই আছে কি না সে সম্বন্ধে কেউ খোঁজ করে প্রমাণ পেয়েছে? আমি সৎ কাজ করছি, অতএব স্বর্গ আমার; আর তুমি পাপ কাজ করছ, কাজেই নরক তোমার জন্যে নির্দ্দিষ্ট,—আগে ভেবে দেখ পাপ পুণ্য কাকে বলে, তার পর স্বর্গনরকের বিচার হবে। তুমি তোমার ছত্রিশ কোটী দেবতা মান, মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম কর, কাজেই স্বর্গে তোমার স্থান; আর আমি কিছু মানি নে, মানি শুধু আমার আত্মাকে, তাই আমি নাস্তিক, সেই জন্যেই আমায় যেতে হবে নরকে। বল দেখি, স্বর্গ কোন দিন দেখেছ, নরক নাম শুনেছ—চোখে দেখতে পেয়েছ? মরে কোথায় যাব তার ঠিক কেউ কোন দিন পায় নি, অথচ এতগুলি প্রাণ যে দেহপিঞ্জর ত্যাগ করে শূন্য পথেই থেকে যাবে, সেকালের লোকেরা তা কল্পনাতেও আনতে পারে নি, তাই তারা মনগড়া দু'টো জায়গা রেখেছে। এ যুগের মানুষ যদি দেখেশুনে বুঝেসুঝেও তাই মানতে চায়, তাদের কি বলব বল দেখি?"

বিস্ময়ে দু'টি চোখ বিস্ফারিত করিয়া কল্যাণী নিমাইয়ের পানে তাকাইয়া রহিল। নিমাই দেবতা মানে না তাহা সে জানে। কিন্তু সে যে স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য, ইহকাল, পরকাল সবই নিঃশেষে উড়াইয়া দিয়াছে, সে খবর সে পায় নাই। জগতে এমন লোকও আছে যে কেবল প্রত্যক্ষ ইহলোকটাকেই মানিয়া যায়, বর্ত্তমানকেই শেষ বলিয়া জানে, ইহার পরে কি আছে তাহা দেখিতে চায় না, মানিতে চায় না?

নিমাই আর কোন কথা না বলিয়া নিজের হাতেই বাক্সটা বন্ধ করিয়া গাড়োয়ানকে বাক্স লইয়া যাইতে ডাকিল। সনাতনকে ডাকিয়া কিছু উপদেশ দিয়া কল্যাণীর পানে তাকাইয়া বলিল, "গাড়ীতে ওঠো, কথাবার্ত্তা

বলতে বলতে যাওয়া যাবে এখন। এদিকে ট্রেনের সময় হয়ে এল, আর দেরী করলে চলবে না।"

কল্যাণী গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া বসিল, নিমাই সামনে বসিল।

'সাদা কাশ ফুলে মাঠের অনেকখানি জায়গা ভরিয়া গিয়াছে, বাতাস আসিয়া তাহাদের পরশ করিয়া বুকে আনন্দের শিহরণ তুলিয়া পলাইতেছে। মাঝে মাঝে ধানের জমী সারি সারি চলিয়াছে। এই মাঠের ওপারে রেল ষ্টেশন।

শ্রান্ত নয়নে সবুজ মাঠের পানে তাকাইয়া কল্যাণী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "অনেক কালের পর আজ ধানের জমি দেখতে পেলুম।"

এতক্ষণ সে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল বলিয়া নিমাইও কথা বলে নাই, এখন সেও কথা কহিল। বলিল, "তুমি যেখানে ছিলে সেখানে বোধ হয় খুব ধানের জমি দেখতে পেতে বউদি?"

আর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কল্যাণী বলিল, "হ্যাঁ, তা পেতুম। আমার মাসীমার বাড়ী হতে খানিক দূরে সবুজ ধানের মাঠ দেখতে পাওয়া যেত। সেখানেও ভাদ্র আশ্বিন মাসে মাঠ ভরে এমনি কাশ ফুল ফুটত, বাতাস এসে তাদের বুকে ঢেউ দিয়ে যেত।"

নিমাই যেন কৌতুক অনুভব করিল, বলিল, "তুমিও এ সব ভাব? এ সব যে কবিদের কথা, তুমি পেলে কোথায়?"

লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিয়া কল্যাণী বলিল, "জানিনে কবিরা কি বলেন না বলেন। তবে আমি যে কবি নই তা তো জানোই।"

নিমাই মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ কাজের কথা নয়। কবিত্ব সবারই প্রাণে আছে,—কম আর বেশী এই যা তফাৎ। যে চালনা করে ফুটিয়ে তুলবার সেই হয় কবি। তা বলে যে বেচারা চালনা করতে পারে নি, সে

অকবি হবে, এমন কথা আমি বলতে পারব না! সেই হিসাবে তুমিও কবি বউদি। এই দেখ না,—একটু কাজের ফাঁক পেয়েছ, তোমার কবিত্ব আবার জেগে উঠেছে।"

কল্যাণী পূর্ব্বকথার জের টানিয়া বলিল, "কারও বা জন্মান্তরের স্মৃতি অটুট থেকে ক্রমোন্নতি হতে হতে একটা জন্মে পূর্ণতা লাভ করে, এ কথা মানবে কি ঠাকুর-পো?"

নিমাই মাথা নাড়িল,—"না, আগেই বলেছি আমি জন্মান্তর মানি নে, কেন না, তার কোনও প্রমাণ আমি পাইনি। এই জন্যেই আমরা যা পাই তা চালনা করে বাড়াতে পারি, বিনা চালনায় তা ধ্বংস হয়ে যায়, এ কথা একটু আগেও বলেছি, এখনও বলছি। জন্মান্তর কথাটা বড় শান্তিপ্রদ, না বউদি? এ জন্মে মানুষ আশা করে অনেক, কিছুই পায় না। তাই সে এই ভেবে প্রাণে এতটুকু শান্তি আনতে চায়—পরজন্ম আছে; আর সেই জন্মে সে তার চাওয়ার ফল পাবেই।"

সে চুপ করিয়া গেল, কল্যাণীও নীরবে রহিল। তাহার এ সব প্রসঙ্গ মোটেই ভালো লাগিতেছিল না। নিমাই তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়া গেলে সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে।

সে গাড়ীর পিছন দিককার ছোট জানালাটি দিয়া বাহিরের পানে অন্যমনস্কভাবে তাকাইয়া রহিল। নিমাইও তাহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া হাতের বইখানা খুলিয়া পড়িতে মন দিল।

ট্রেণ পুরী ষ্টেশনে গিয়া পৌছিল। একখানা গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাতে কল্যাণীকে উঠাইয়া নিমাই নিজেও উঠিয়া বসিল।

সুটকেশটী ঠিক করিয়া রাখিতে রাখিতে সে মুখ তুলিয়া বলিল, "এলে ভালোই হল বউদি, নিজের চোখে দেখে যা বিশ্বাস করতে পারবে, অন্য কেউ হাজার শপথ করে বললেও তা বিশ্বাস করবে না। আমি তোমার একটী কথায় কখনও এখানে আসতুম না, তবে কিনা এরপর বিশুদার কাছে গল্প করবে—আমি তো যেতে চেয়েছিলুম, ঠাকুরপোই আমায় নিয়ে গেল না। ভাবলুম কেন নিমিত্তের ভাগি হয়ে থাকি, তোমায় একবার দেখিয়ে নিয়ে যাই বিশুদা কতখানি অযত্নে অনাদরে রয়েছে।"

স্বর্গদ্বারে নন্দা বাসা লইয়াছিল, এ ঠিকানা নিমাই পূর্ব্বেই যোগাড় করিয়াছিল।

দ্বারদেশে গাড়ী থামিবামাত্র দাসী চাকরেরা সব ছুটিয়া আসিল।

দেশের কৈবর্ত্তদের ছেলে শ্রীরূপ দাস নন্দার সহিত আসিয়াছিল। ইহাকে কল্যাণী ছোট বেলা হইতে বেশ ভালোরূপেই চিনিত। প্রথমটায় সে আসিতে চাহে নাই, তাহার পর নেহাৎ কেবল জগন্নাথ দর্শনের প্রলোভনে সে চাকরী ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছে।

শ্রীরূপ হঠাৎ কল্যাণীকে নামিতে দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল। প্রথমটায় সে দুইটী চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাকাইয়া রহিল; তাহার পর এক মুখ হাসিয়া মাথা নীচু করিয়া তাহার পায়ের ধূলো লইয়া

মাথায় দিয়া বলিল, "মাসীমা এসেছেন যে, মামাবাবুর অসুখের খবর পেয়েছেন বুঝি ?"

কল্যাণী আশীর্ব্বাদ করিতে ভুলিয়া গেল, ব্যগ্র হই[illegible] জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ, কেমন আছেন তিনি ?"

শ্রীরূপ উত্তর দিল, "এখন একটু ভালো আছেন, জ্বর এখনও হয় সামান্য করে, ছেড়েও যায়। অন্য সব রোগ কমে গেছে, জীবনের ভয় আর নেই। ডাক্তারেরা আগে সাহস দেননি, এখন সাহস দিয়েছেন, বলেছেন আর দু চার দিন পরেই উঠে বেড়াবেন।"

আশ্বস্ত হইয়া কল্যাণী একটা হালকা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "বাঁচালি খবরটা দিয়ে। অসুখের খবর পেয়ে মনের যে অবস্থা হয়েছিল তা বলা যায় না। জগন্নাথ তোর মামাবাবুকে ভালো করে দিন, ওঁকে নিয়ে যাওয়ার দিন আমি ঠাকুর দেখে পূজো দিয়ে [illegible]।'

পরম ভক্তি-ভরে সে হাত দু'খানি কপালে ছোঁয়াইল।

শ্রীরূপ উভয়কে ঘরে লইয়া গেল। নিমাইয়ের ভার আর একটী লোকের উপর দিয়া তাহাকে গোপনে ডাকিয়া বুঝাইয়া দিল বাবুর যেন এতটুকু অযত্ন না হয়, তাহা হইলে মা আর আস্ত রাখিবেন না।

কল্যাণীকে লইয়া সে বরাবর উপরে চলিয়া গেল।

উপরের বড় দালানটার পাশে একটী ঘর; সামনা-সামনি তিনটী দরজায় নীল রংয়ের পর্দ্দা ঝুলিতেছিল। শ্রীরূপ চুপি চুপি বলিল, "এই ঘরে মামাবাবু আছেন, আমি গিয়ে আগে খবর দিই, আপনি একটু দাঁড়ান।"

ভিতরে নন্দা তখন ঔষধ খাওয়াইবার জন্য কখনও অনুনয় বিনয়, কখনও তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে, কিন্তু বিশ্বপতি অটুট অচল। সে

এক গোঁ ধরিয়া আছে এখন কিছুতেই ঔষধ খাইব না, একটু পরে খাইবে।

শ্রীরূপ পরদা সরাইতেই কল্যাণীর দৃষ্টিতে পড়িল মূল্যবান খাটিয়াতে মূল্যবান শয্যার উপর শায়িত বিশ্বপতি, পার্শ্বে মেজার গ্লাসে ঔষধ লইয়া দাঁড়াইয়া নন্দা।

বুকের ভিতরটা কি রকম করিয়া উঠিল। সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইল, এ দৃশ্য যেন সে সহিতে পারিতেছিল না।

শ্রীরূপকে দাঁড়াইতে দেখিয়া নন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে, কি চাস্?"

শ্রীরূপ বলিল, "দেশ হতে মামীমা এসেছেন। তিনি কার মুখে মামাবাবুর অসুখের খবর পেয়ে—"

বিশ্বপতি দেয়ালের দিকে ফিরিয়া শুইয়াছিল, তাড়াতাড়ি এদিকে ফিরিল, রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "রাঙাবউ এসেছে?"

শ্রীরূপ উত্তর দিল, "আজ্ঞে?"

ঔষধের গ্লাসটা নামাইয়া রাখিয়া ব্যস্ত হইয়া নন্দা বলিল, "বউদি এসেছে,—কোথায় রে?"

শ্রীরূপ বলিল, "এই যে, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।"

নন্দা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া গেল।

দরজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কল্যাণী। তাহার মুখখানা তখন মরার মতই মলিন হইয়া উঠিয়াছিল।

অপরিচিতা নন্দা আসিয়া তাহার হাত দু'খানা চাপিয়া ধরিল, "বেশ করেছ, তুমি এসেছ ভাই। বিশু দার অসুখের বাড়াবাড়ির সময় তোমায় খবর দেওয়ার কথা বলেছিলুম, কিন্তু বিশুদা কিছুতেই খবর দিতে দিলেন

না ; বললেন—খবর দিয়ে অনর্থক মানুষটাকে ভাবিয়ে তোলা হবে ; সে তো আসতে পারবে না, কেবল কেঁদে-কেটে অস্থির হবে। তার চেয়ে ভালো হয়ে উঠে একেবারে বাড়ী চলে যাব, তখন জানতে পারলেও কোন ক্ষতি হবে না। সত্যি ভাই, উনি খবর দিতে দিলেন না বলেই খবর পাঠাই নি, নইলে তোমার স্বামী, তুমি তাঁর স্ত্রী, তোমায় তাঁর এত ব্যারামের খবর না দিয়ে থাকতে পারি ?"

নিছক ন্যাকামোপূর্ণ কথাগুলি কল্যাণীর অন্তরটাকে আরও বেশী জ্বালাইয়া দিল, মুখখানা তাহার বিকৃত হইয়া উঠিল, সে একবার একটু হাসিতে গেল, হাসি ফুটিল না।

নন্দা বলিল, "বাইরে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ভেতরে এসো ভাই, দেখবে চল।"

সে কল্যাণীকে এক রকম প্রায় টানিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল।

"চেয়ে দেখ বিশুদা, কে এসেছে ? বেশ মানুষ তো তুমি,—তুমিই না কত কথা বলেছিলে—বউদি নাকি তোমায় দেখতে পারে না, ভালো বাসে না। তাই তো বলি, এও কি একটা কথার মত কথা যে স্ত্রী নাকি তার স্বামীকে দেখতে পারবে না, ভালো বাসবে না। যাই বল, তুমি যে পয়লা নম্বরের মিথ্যাবাদী এ কথা হাজার বার বলব।"

বলিতে বলিতে সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বিশ্বপতি দেয়ালের দিকে ফিরিয়া শুইয়া ছিল, এ কথা শুনিয়া তাহার মুখের ভাব যে কিরূপ হইয়া গেল তাহা কল্যাণী দেখিতে পাইল না। কল্যাণী একবার মাত্র চোখ তুলিয়া স্বামীর পানে তাকাইয়াই চোখ ফিরাইল।

নন্দা কলহাস্যের সঙ্গে বলিল, "বলি উত্তর দিচ্ছ না যে, একটা কথা

বলবারও কি ইচ্ছে হচ্ছে না? সেদিন তর্ক করছিলে না ভারতে সতীর আদর্শ নেই, সীতা সাবিত্রীর কথা সব মিছে, কেবল কল্পনা মাত্র। দেখ দেখি, সত্যিই ভারতে সতী মেয়ে আছে কিনা, আজ সেটা মানতে পারবে কি?"

বিশ্বপতি উত্তর দিল না, এ দিকে ফিরিল না।

হার মানিয়া নন্দা বলিল, "থাক বাপু, তোমার সঙ্গে এখন আর কথা বলছিনে। এসো বউদি, বিশুদা খানিক শুয়ে থাক, তারপরে আসব এখন। এসো বউদি, আগে স্নান করে একটু জল খেয়ে এসে বসো, কাল সারারাত ট্রেনে কেটেছে, শরীর নিশ্চয়ই খারাপ হয়ে রয়েছে।"

কল্যাণীর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া চলিতে চলিতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, "ওষুধটা খেয়ো বিশুদা, যেন ফেলে দিয়ে বলো না—খেয়েছি।"

ওষধ মাথার কাছে টিপয়ের উপর যেমন ছিল তেমনই পড়িয়া রহিল, বিশ্বপতি যেমন শুইয়া ছিল তেমনই শুইয়া রহিল, সে নড়িল না, এ দিকে ফিরিলও না।

ঘণ্টাখানেক পরে নন্দা কল্যাণীকে লইয়া আবার ফিরিয়া আসিল।

"আঃ পোড়াকপাল, কি রকম আক্কেল তোমার বিশুদা, এখনও ওষুধটা খাও নি। ও আজ বউদি এসেছে কিনা, আমার হাতে খাবে কেন, এখন বউদির হাতেই খাবে তো। নাও ভাই বউদি, ও ওষুধটা ফেলে দাও, আর এক দাগ ওষুধ ঢেলে খাইয়ে দিয়ো, দেরী করো না।"

সে মৃদু হাসিয়া বাহির হইয়া গেল।

কল্যাণী কতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কতবার নড়িল, কতবার

তাহার চাবির শব্দ হইল, বিশ্বপতি সাড়া পাইয়াও ফিরিল না, জাগিয়া থাকিবার কোন চিহ্নও দেখা গেল না।

অনেকক্ষণ আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইল; নীচু হইয়া হাতখানা স্বামীর কপালে রাখিয়া সে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি এসেছি বলে কি রাগ করেছ?"

বিশ্বপতি এ-পাশে ফিরিল, দুইটী চোখের দৃষ্টি স্ত্রীর মুখের উপর রাখিয়া রুক্ষকণ্ঠে বলিল, "একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, তোমায় এখানে আসতে কে বলেছে রাঙা-বউ?"

তাহার মুখের পানে তাকাইয়া এবং তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া কল্যাণী স্তব্ধ হইয়া গেল।

কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে শুষ্ককণ্ঠে বলিল, "কেউ আসতে বলে নি, আমি নিজেই এসেছি। এখানে আসায় তোমার কোনও ক্ষতি হয়েছে কি?"

বিশ্বপতি একমুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল, "হয়েছে বই কি। তোমার এখানে আসায় নন্দাকে কতটা অপদস্থ করা হয়েছে সে কথাটা ভেবে দেখেছ কি? নন্দা তোমায় দেখে নিশ্চয়ই মনে করেছে—তুমি কোন মে আমার অসুখের কথা শুনে মনে ভেবে নিয়েছ আমার সেবাশুশ্রূষা হচ্ছে না, সেই জন্যেই ছুটে এসেছ। অথচ তুমি জানো না, স্বপ্নেও ধারণা করতে পারবে না, সে আমার কি রকম ভাবে সেবা করছে। এ রকম সেবা হয় তো তোমার কাছেও পেতুম না রাঙাবউ, কারণ সংসারের কাজ তোমায় করতেই হবে, কিন্তু তার কোন কাজ নেই।"

একটু থামিয়া দম লইয়া সে বলিল, "বুঝতে পারছি আমার কথা শুনে

তোমার মনে কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কি করব,—অপ্রিয় সত্য আমায় প্রকাশ করতেই হবে, তোমার মনে কষ্ট হবে জেনেও। নন্দা তোমায় দেখে প্রচুর হাসছে, আমার ভার তোমার পরে ছেড়ে দিয়ে গেছে; ওর ওই হাসির তলায় যে কতখানি বেদনা জমে উঠেছে, সেটা অনুভব করবার শক্তি তোমার আছে কি?"

কল্যাণীর মুখখানা একেবারে পাংশু হইয়া গেল, সে আর চোখ তুলিয়া স্বামীর পানে চাইতে পারিল না; নতমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিশ্বপতি বলিল, "আমার জন্যে তোমার এই ব্যগ্রতা এই অসামান্য স্বামী-ভক্তি না দেখালেই ভাল হতো রাঙাবউ; নিজের নামটার আগে পতিব্রতা শব্দটা না জুড়ে দিলেও বিশেষ ক্ষতি হতো না। এর চেয়ে তুমি যদি ঘরের বউটি হয়ে সেইখানে সেই ঘরে বসে চোখের জলে মাটি ভিজিয়ে ফেলতে, আমার মতে সেইটাই হতো স্বামী-ভক্তির চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। আমাদের মত ঘরের বউয়েদের স্বামীর বিদেশে ব্যারাম জেনে কয়জন ঘর ছেড়ে স্বামীকে দেখতে ছোটে বল দেখি? তারপর এসেছ কার সঙ্গে। ওর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? একজন নিঃসম্পর্কীয় লোকের সঙ্গে আসা কি তোমার উচিত হয়েছে রাঙাবউ? সত্যিই সে কথা, এতে কেউ তোমার অসাধারণ স্বামীভক্তির কথা সগৌরবে বলে গেলেও আমি কোনদিনই প্রশংসা করব না।"

কল্যাণী মুখ তুলিল, তাহার পাংশু মুখ তখন আবার স্বাভাবিক বর্ণ ধরিয়াছে।

যথাসাধ্য কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া সে বলিল, "কিন্তু ওখানেই বুঝতে ভুল করেছ! আমি সতী, স্বামীর 'পরে আমার নিষ্ঠা আর ভক্তি আছে, এই কথাটাই লোক-সমাজে রাষ্ট্র করবার জন্যে আমি নিমাই ঠাকুরপোর

সঙ্গে এখানে এতদূর চলে আসতুম না। সত্যিই আগে বুঝতে পারি নি, এখানে পা দিয়েই বুঝতে পেরেছি কতটা বোকামীর কাজ করেছি! কিন্তু না, ভয় নেই, আমি এখানে থাকব না, তোমাদের সঙ্কুচিত বিব্রত করব না, আমি আজই যেমন এসেছি, তেমনই চলে যাব।"

সে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গিয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইল।

অদূরে ধূ ধূ করিতেছে বেলাভূমি। তাহার ও-পাশে অনন্ত জলরাশি গর্জ্জন করিয়া উচ্চ তরঙ্গ তুলিয়া আসিতেছে, বেলাভূমির বুকে আছাড় খাইয়া ফেনরাশি বুকে লইয়া সরিয়া যাইতেছে।

সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া কল্যাণীর চোখ দুইটী জ্বালা করিতে লাগিল।

তাহার পর হঠাৎ কখন দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, কখন তাহা চোখ ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

আজই কল্যাণী ফিরিয়া যাইতে চায় শুনিয়া নন্দা একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িল—

"সে কি বউদি, এ কখনও হতে পারে। আজ এসে আজই তুমি চলে যেতে চাও, এ কি একটা কথার মত কথা ?"

কল্যাণী শুষ্ক হাসিয়া জানাইল সে স্বামীকে একবার মাত্র চোখের দেখা দেখিতে আসিয়াছিল। সে সাধ তাহার মিটিয়া গেছে, স্বামী অনেক ভালো আছেন দেখিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়াছে ! আর এখানে থাকার কোন আবশ্যক তাহার নাই ; ওদিকে বাড়ী ঘর সব পড়িয়া আছে, দেখিবার লোক কেহ নাই—ইত্যাদি—ইত্যাদি।

নন্দা রাগ করিল, মুখ ভার করিয়া বলিল, "বাড়ী ঘর করে করেই যে গেলে, বাড়ী ঘর তোমায় স্বর্গে দেবে, না ? যেমন কর্ত্তা তেমনি গিন্নি ; কর্ত্তা কি সহজে আসে,—ভাবলুম বুঝি কেঁদেই ফেলে। কথার মধ্যে কথাই ওই বাড়ী ঘর দেখবে কে, সব যাবে। বাবাঃ,—কিই বা ঘর ; সব তো ভাঙ্গছে, চূরছে, ইঁট খসছে,—যেন সমস্ত বাড়ীই দাঁত বার করে হাসছে। সেই বাড়ীতে এমন সব দামী জিনিসপত্রও আছে যা পথের ভিখারী পর্য্যন্ত পথ দিয়ে ঠেলে চলে যায়।"

কল্যাণীর বড় বড় চোখ দুইটী একবার মাত্র দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, তাহার মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্যই বিকৃত হইয়া উঠিল। তখনই সে মুখে হাসি ফুটাইয়া মিষ্ট স্বরেই বলিল, "কিন্তু তাই আমার লাখটাকার জিনিস ভাই দিদি। গরীবের ঘরে জন্মেছি, সামান্য নুন ভাত খেয়েই মানুষ

হয়েছি। তার বেশী পাওয়ার কামনা যদি কোনদিন মাথা তুলে উঠতে চেয়েছে, আমি তাকে চেপে ধরেছি। নিজের খড়ের ঘরে নুন-ভাত শাক-ভাত যা জোটে, তাই যে কোন লোকের মনুষ্যত্ব বজায় রাখতে যথেষ্ট বলেই মনে করি। বড়লোকের বাড়ী রোজ ষোড়শোপচারে খাওয়া আর দামী পালঙ্কে শুয়ে ঘুমানতে মানুষের হীনত্বের পরিচয়ই দিয়ে থাকে; সে রকম আরামপ্রিয় সুখী লোককে কেউ মানুষ বলে গণনা করে না।”

কল্যাণীর এই সুন্দর সত্য কথাগুলি নন্দার বুকের মধ্যে আঘাত দিল বেশ, মুখরা চপলা নন্দা একেবারে নির্ব্বাক হইয়া গেল। কল্যাণীকে সে কৃপার চোখেই দেখিয়া আসিতেছে। সে বেশই জানে এ মেয়েটী কোন-দিনই মাথা উঁচু করিতে পারিবে না। ইহাকে যতই কেন না আঘাত করিয়া যাও, এ মাথা নীচু করিয়াই থাকিবে, ফিরাইয়া আঘাত সে কোনদিনই দিতে পারিবে না। চিরদিন সে দূর্ব্বার মত মাটীর বুকেই থাকিবে, মানুষের পায়ের তলে দলিত পিষ্ট হইবে; সে যে আছে তাহা কাহাকেও কোনদিন জানিতে দিবে না।

আজ নন্দা নিঃশব্দে কেবল তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

বাড়বানল জলেই দেখা যায়;—সে অনলে যে অনেক কিছুই ধ্বংস করিতে পারে, তাহা সে আগে জানে নাই, আজই জানিল।

নিমাই আহারান্তে নীচে একটী ঘরে বিশ্রাম করিতেছিল; ভিতরে যে এত কাণ্ড হইয়া গেছে তাহা সে কিছুই জানিতে পারে নাই। কল্যাণী খোঁজ লইয়া যে ঘরে সে ছিল সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

“শুয়ে পড়লে যে ঠাকুরপো? ওঠো, বিশ্রামের সময় তোমার নেই, এখনই রওনা হতে হবে, এখানে থাকার অধিকার নেই, যাওয়ার হুকুম হয়েছে।”

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া নিমাই উঠিয়া বসিল, জিজ্ঞাসা করিল, "বাঃ, আজ এসে পৌঁছেই চলে যেতে হবে এ আশ্চর্য্য হুকুমটা কে দিলে শুনি। নন্দা বুঝি? রোসো, তার সঙ্গে দেখা করে আমি এ সম্বন্ধে বোঝাপড়া করে নিচ্ছি, এ সব তোমার কর্ম্ম নয় বউদি।"

অতি কষ্টে চোখের জল সামলাইয়া বিকৃত হাসির টুকরা একটু মুখের উপর টানিয়া আনিয়া কল্যাণী চাপা স্বরে বলিল, "না, তার হুকুম শুনবার সৌভাগ্য এখনও আমার হয় নি, তবে এখানে একদিনের বেশী থাকতে গেলেই যে শুনতে হবে তাতে সন্দেহ নেই। হুকুম সে দেয় নি। যার হুকুম দেওয়ার অধিকার আছে, আমার সেই মনিব আমায় চলে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন।"

নিমাই খানিকক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিল,—তারপর পর বলিল, "কে, বিশুদা বলেছে তোমায় আজই চলে যেতে হবে?"

কল্যাণী রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তাই বই আর কি। তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন আমার এখানে আসাই অন্যায় হয়েছে। ভেবে দেখলুম তিনি যা বলেছেন তা অন্যায় নয়, সবই সত্যি। তাই ঠাকুরপো, আমি এখনই চলে যেতে চাই, আর একটী ঘণ্টাও এখানে থাকতে পারব না। তুমি ওঠ, একখানা গাড়ী নিয়ে এসো, একটুও দেরী করো না।"

নিমাই উঠিতে চাহে না; বলিল, "তুমি বড় অধৈর্য্য বউদি, আসতে যেমন—যেতেও ঠিক তেমনি। আমি আগেই বলেছিলুম না—, থাক সে কথা; কিন্তু কি যে তোমাদের কথাবার্ত্তা হল যার জন্যে আর একটী ঘণ্টাও তুমি এ বাড়ীতে থাকবে না, সেটা জানতে পারলেও যে হতো।"

কল্যাণী কঠিন মুখে বলিল, "আসল কথা, তুমি এখন এমন আরাম ছেড়ে নড়তে চাও না—কেমন? কিন্তু শোন ঠাকুরপো, যদি তুমি না যাও, গাড়ী না ডাক, আমি একাই পায়ে হেঁটে চলে যাব, পথে কাউকে সঙ্গে নিয়ে ষ্টেশনে যাব, তোমার সাহায্যের কোনও দরকার হবে না : তুমি আমার যাওয়ার গাড়ীভাড়াটা দিয়ে দাও দেখি, তা হলেই যথেষ্ট দয়া মনে করব।"

ব্যাপারটা যে বিশেষ গুরুতর রকমই ঘটিয়াছে, তাহা বুঝিতে নিমাইয়ের বিলম্ব হইল না। সে উঠিয়া পড়িল, "গাড়ীর জন্যে ভাবনা নেই বউদি, আমি এখনই টাঙ্গা নিয়ে আসছি, কিন্তু ষ্টেশনে গিয়ে এখন বসেই থাকতে হবে; ট্রেণ তো এখন নেই, সেই সন্ধ্যায় ট্রেণ।"

কল্যাণী বলিল, "তা হোক, আমি সেখানে বসে থাকব সেও আমার ভালো, আমি এখানে আর এক মিনিটও থাকব না।"

ব্যাপারটা যে কি ঘটিয়াছে তাহা নিমাই স্পষ্ট জানিতে না পারিলেও আন্দাজে কতকটা বুঝিল; সে উঠিয়া গায়ে জামা দিয়া গাড়ী ডাকিতে চলিয়া গেল।

উপর হইতে নন্দার কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছিল, "এ রকম করলে আমি কি করে পারব বল দেখি বিশুদা? সেই কখন হতে দুধটুকু খাওয়ার জন্যে সাধাসাধি করছি, কথা যেন কানে যাচ্ছে না, ঘুমোনোর ভাণে আড়ষ্ট হয়ে চুপ করে পড়ে আছ। না বাপু, আমারই ঝকমারী হয়েছে তোমায় এখানে আনা, তার জন্যে এই নাক কান মলা খাচ্ছি। তুমি একটু ভালো হয়ে দু'দিন দু'টো ভাত খেয়ে বউদির সঙ্গে বাড়ী চলে যেয়ো, আমি আর যদি একদিন তোমায় এখানে থাকবার জন্যে অনুরোধ করি তবে আমার নাম নন্দা নয়।"

কল্যাণী কান পাতিয়া শুনিতে লাগিল।

অসীম অনন্ত ব্যবধান,—সে যাহাকে কাছে পাইতে চায়। দূর দূরই থাকিয়া যাইবে, কেহ কাহারও নাগাল জীবনে পাইবে না।

বিবাহ-বন্ধন—

আজ সে কথা মনে করিতেও হাসি পায়। লোকে বলে "সাত পাকের বিবাহ—চৌদ্দ পাকে খুলে না,—" এ কথা কি সত্য?

সাত পাক—সে একটা মিথ্যা আচার মাত্র; নারায়ণ—সাক্ষী গোপাল। সেই বিবাহের দিনে যাহারা উপস্থিত ছিল আজ তাহারা কে কোথায়?

শুধু বুকটাই জ্বলিতে লাগিল, চোখে এক বিন্দু জল আসিল না। দরজাটা চাপিয়া ধরিয়া কল্যাণী শূন্য নয়নে কোন্‌দিক পানে তাকাইয়া রহিল কে জানে।

১১

গাড়ী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল।

নন্দা উপরের বারাণ্ডা হইতে মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া নীচে নামিয়া আসিল।

"কাজটা ভালো হচ্ছে কি ভাই বউদি? এই আজই মাত্র এসে এতটুকু বিশ্রাম না করে অমনি চললে, এটা কি ভালো কাজ করছ? তোমার নিজের তরফ থেকে কোন কথা না থাকিলেও থাকতে পারে, কিন্তু গৃহস্থের কল্যাণ-অকল্যাণটাও দেখা চাই তো?"

কল্যাণী বলিল, "আমার হঠাৎ আসা আর হঠাৎ চলে যাওয়ায় গৃহস্থের অকল্যাণ হবে না ভাই দিদিমণি, ভগবান তোমাদের মঙ্গলই করবেন। আমি একটা অশুভ গ্রহের মত হঠাৎ আকাশে উঠে পড়েছি; থাকলে বরং অনিষ্টই হবে, মিলিয়ে গেলে ইষ্ট ছাড়া অনিষ্ট হবে না।"

নন্দা বিমর্ষ মুখে খানিক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার পর বলিল, "তোমায় আমি আর রাখতে চাইনে; বউদি, তোমার এ রকম মন নিয়ে এখানে থাকার চেয়ে চলে যাওয়াই ভালো। কিন্তু বিশুদার সঙ্গে একবার দেখা করে যাবে না?"

কল্যাণীর মুখখানা কঠিন হইয়া উঠিল, সে মাথা নাড়িল, বলিল, "দরকার দেখছি নে।"

এতটুকু আঘাত দেওয়ার প্রলোভন নন্দা এড়াইতে পারিল না, মৃদু হাসিয়া বলিল, "কিন্তু সেটা তো উচিত হবে না বউদি, সতী মেয়ের কাজ

এ নয়। যে সতীর আদর্শ তোমায় বাংলার না-জানা একটী ছোট্ট পল্লী হতে অপরিচিত একটী পুরুষকে সাথী করে এতদূরে এখানে টেনে এনেছে, তোমার এই কাজে সেই মহান আদর্শ খাটো হয়ে যাবে না কি ?”

কল্যাণী দৃপ্ত দুইটী চোখের দৃষ্টি নন্দার মুখের উপর স্থাপন করিল, বলিল, “না, আমার সে আদর্শকে আমি নিজের হাতে আছাড় দিয়ে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে ফেলেছি। তার সেই গুঁড়োগুলো রেণু রেণু করে ধূলোর সাথে মিশিয়ে বাতাসের কোলে ছেড়ে দিয়েছি। আজ বুঝেছি, স্বপ্নেরও ভিত্তি চাই, নইলে তা গড়ে উঠতে পারে না, তার ছায়া মনে থাকে না। ভুল ততক্ষণই সত্যি বলে বোধ হয়, যতক্ষণ তার স্বরূপটা চোখে না পড়ে। সেই স্বরূপ যখন চোখে পড়ে, তখন তার দাম এক কানা-কড়িও হয় না, এ কথা বোধ হয় মেনে নেবে। মেয়েরা যে আদর্শ নিয়ে চলবে, সে আদর্শ টিঁকে থাকতে পারে কতক্ষণ ? মেয়েরা যার পরে নির্ভর করে তার আদর্শ অটুট রাখবার চেষ্টা করবে, সে যদি ভার নেওয়ার অনুপযুক্ত হয়, সে যদি ভেঙ্গে পড়ে, যে ভর দিয়ে দাঁড়ায় তাকেও পড়তে হবে। পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় না দিলে একটা আদর্শকে ঠিক রাখা চলে না, সে আদর্শ এমনই করে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে যায়, তার অস্তিত্ব পর্যান্ত থাকে না। আমার কথা বলবে দিদিমণি ? আজ দেখছি ছায়াকে কায়া বলে ধরতে ছুটেছিলুম,—আজ দেখছি, সব মিথ্যে, আমার কিছু সার্থকতায় ভরে উঠতে পারলে না।”

তাহার কণ্ঠস্বর আবেগে কাঁপিতেছিল ; পাছে সে দুর্ব্বলতা নন্দা বুঝিতে পারে এই জন্যই সে তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

নন্দা বলিল, “ওটা ভাই তোমার মিথ্যে কল্পনা। পুরুষেরা শতকরা

নব্বইজন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে থাকে, কদাচিত যদি তোমার আদর্শ অনুযায়ী স্বামী দেখিতে পাওয়া যায়, যারা রামের মতই স্বামীর কর্ত্তব্য পালন করে যায়। যারা উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির হয় তাদের স্ত্রীরা যে তোমার মত অধীর চঞ্চল হয়ে ওঠে না, এ কথা ঠিক। এই সব স্ত্রীরা তো তাদের স্বামী বেচারাদের তোমার মত সন্দেহের চোখে দেখে পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ায় না; তারা সেদিকে চেয়েও দেখে না। পুরাণের কথা যদি তোলো, যাদের আদর্শ নিয়ে তোমরা চলছ, তাদের মধ্যেও ঠিক এই রকম ভাব ছিল বলেই না তারা আদর্শ সতী হতে পেরেছিল। বেদবতী কি করেছিলেন শুনি? তিনি স্বামীর বাসনা পূর্ণ করতে কুষ্ঠাক্রান্ত স্বামীকে কোলে নিয়ে লক্ষহীরার বাড়ী যান নি? তিনি কি ব্রাহ্মণের মেয়ে ব্রাহ্মণের স্ত্রী হয়ে পতিতা নারীর বাড়ীতে দাসীর কাজ করেন নি? রাবণ যে বহু নারীর স্বামী ছিলেন, তাই বলে মন্দোদরী তাঁকে ঘৃণা করেছিলেন? তাঁর পর হতে শ্রদ্ধা ভক্তি অন্তর্হিত হয়েছিল? হিন্দুর পরমদেবতা কৃষ্ণ কি করতেন শুনি, তাই বলে রাধিকা তাঁকে ঘৃণা করে ত্যাগ করেছিলেন?"

নন্দা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কল্যাণী গম্ভীর হইয়া বলিল, "ওইখানেই যে প্রকাণ্ড বড় ভুল হয়ে গেছে দিদি। আমরা—মেয়েরা যুগে যুগে পতিব্রতার আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখতে এমনি করে নিজেদের সব রকমে হেয় করে রাখছি, নিজেদের সর্ব্বনাশ করছি। ওদের হীন বাসনা তৃপ্তির জন্যে আমরাই নিজেদের সত্ত্বা ভুলে পতিতার দুয়ারে হাত পেতে দাঁড়িয়েছি, স্বামীকে কোলে করে তার বাড়ীতে নিয়ে গেছি। নারীর অধঃপতন আর কাকে বলে? স্বামী অন্য কারও সঙ্গে বাস করছেন, আমি দাসীর মত তাঁর সেবা করব,

সেই স্বামীকেই একমাত্র দেবতা জেনে পূজো করে যাব, তাঁর আদেশে আমি বেঁচে থাকব, মরব, কারণ আমি সতী, আমি পতিব্রতা ; আমায় এ আদর্শ অটুট রাখতেই হবে। এমনি করে আমরাই না ওদের ধ্বংসের পথে অগ্রসর করে দিয়েছি, সহধর্ম্মিণী না হয়ে সহচারিণী হয়েছি, ওদের বাসনা কামনা বাড়িয়ে তুলেছি, নিজেদের সব দিক হতে গুটিয়ে এনে সতী নামটা নিয়ে জগতে নিজেদের প্রচার করে যাচ্ছি। শাস্ত্রের কথা ভুলে রেখে দাও দিদি, ওই শাস্ত্রের অনুশাসনগুলো কেবল আমাদের জন্যেই নয় কি ? পুরুষেরা এর একটাও কি মেনে চলে ? ওই অনুশাসন—ওই চোখ-রাঙানীই না আমাদের এত তুচ্ছ, এত হেয় করে রেখেছে। স্বামী চোখের সামনে ব্যাভিচার করবেন, আমাদের তা দেখে যেতে হবে, সয়ে যেতে হবে, তবু সেই স্বামীকেই দেবতা বলে পূজো করতে হবে, এরই নাম সতীত্ব, এরই নাম পাতিব্রত্য। তোমার ওই পচা শাস্ত্রের কথা ভুলে রেখে দাও দিদি ; চোখের সামনে যা অহরহ দেখতে পাচ্ছি, তার সত্যতা না মেনে নিয়ে যা দেখিনি তার সত্যতা প্রতিপন্ন করবার মত শক্তি তোমার থাকতে পারে—আমার নেই।”

নন্দা কি বলিবে বলিয়া মুখ তুলিল, তাহার পরই হঠাৎ মুখ নামাইয়া চুপ করিয়াই রহিল।

কল্যাণী দুই পা অগ্রসর হইয়া গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল ; বলিল, “কিন্তু তুমি আমার অপরাধ ক্ষমার চোখে দেখে যেয়ো ভাই দিদিমণি, মনে কোরো—মানুষ কোনক্রমে চোখ বুজে একটাই আঘাত সইতে পারে, কেননা তার আগে সে কোনও আঘাত পায় নি বলেই আঘাতের বেদনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয়ে থাকে। বুকের একদিক ভাঙ্গলে পরে সেই দিকটাতেই মানুষের চোখে পড়ে থাকে, কিন্তু যদি সব হাড়গুলোই তার

ভেঙ্গে যায় সে কোন্‌দিকে তাকাবে, তাই ভেবেই ঠিক করতে পারে না। একটা বিষ-ফোড়া উঠলে মানুষ তার দিকে নজর দেয়, তার ব্যথায় অধীর হয়ে ওঠে; কিন্তু যদি দেহে হাজারটা বিষফোড়া ওঠে, কোন্‌টা যে বেশী ব্যথা করছে, কোন্‌টা রেখে কোন্‌টা যে সে দেখবে, তাই ভেবে ঠিক করতে পারে না। একটা ফোড়ায় সে হাজার রকম ওষুধ দিয়েছে। কিন্তু হাজার ফোড়ায় একটা ওষুধ লাগিয়েই সে তখন খুসি হয়ে থাকে, কারণ তখন তার খুসি না হওয়া ছাড়া আর উপায়ই থাকে না যে। তখন তার ইচ্ছা আসে না, প্রবৃত্তি জাগে না, দেহ মন একেবারেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। মানুষ মাত্রেই যে এই একই ধারায় চলছে দিদি, কেবল একটার কথাই তো হচ্ছে না যে তুমি কোনও প্রতিবাদ করবে।"

নন্দা ফস্‌ করিয়া বলিয়া বসিল, "একটু একটু করে ওষুধ লাগানোর চেয়ে সবগুলো যদি কেটে দেওয়া যায়—"

শিহরিয়া উঠিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কল্যাণী বলিল, "ওই তো ভুল, বলা সহজ, করাই না কঠিন। বলি—সেই যে গভীর বেদনা—সেটাই বা সইবে কে দিদি? দেখ, মানুষ দেবতা নয়,—মানুষ মানুষই। তার দেহটা কি কি উপাদানে তৈরী তা জান তো? ছুরি চালানো দূরের কথা, তোমার গায়ে আমি একটা ছুঁচ বিঁধিয়ে দিলে তুমি চমকে ওঠো কি না বল দেখি? ওই তো দিদি, দুর্ব্বলতা মানুষের যে ওইখানেই। সবাই তো পরমহংস হতে পারে না ভাই, সবাই কিছু বলতে পারে না এ-গালে চড় মারলে ও-গাল ফিরিয়ে দেব। অতটা সহ্যশীলতা যে দিন পাব, সেদিন আর কাউকে শিষ্য করার আগে তোমায় দীক্ষা দেব তা মনে করে রেখো।"

নন্দার গৌর মুখখানা কালো হইয়া গিয়াছিল; সে নীরবে কেবল অধর

দংশন করিতে লাগিল। তাহার সম্মুখে কল্যাণী গিয়া গাড়ীতে উঠিল, নিমাই তাহার সম্মুখের আসন দখল করিয়া বসিল। তাহার পর গাড়ী চলিয়া গেল, তাহার শব্দটাও ক্রমে মিলাইয়া গেল। নন্দা তখনও চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া কল্যাণীর কথাই ভাবিতেছিল।

হঠাৎ একসময় মুখ তুলিতেই দৃষ্টি পড়িল উপরের খোলা জানালাটার দিকে ;—বিশ্বপতি সেই জানালার গরাদে ধরিয়া যে-পথে একটু আগে গাড়ীখানা চলিয়া গেছে, সেই পথের পানে আত্মহারার মতই তাকাইয়া আছে।

আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া নন্দা বলিল, "বিশুদা, দাঁড়িয়েছ একেবারে,—পড়ে যাবে যে এখনি।"

তাহার ব্যগ্রকণ্ঠের সুরেই বিশ্বপতির চেতনা ফিরিয়া আসিল, সে নীচে নন্দার পানে তাকাইল, একটু হাসির রেখা মাত্র তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল এবং সে জানালা ছাড়িয়া সরিয়া গেল।

কল্যাণী গুম হইয়া ষ্টেশনে একখানা বেঞ্চে বসিয়া ছিল। পথে সে একেবারেই মুখ বন্ধ করিয়াছিল। নিমাই তাহার প্রকৃতি বেশ জানিত, সেই জন্যই সে তাহার সহিত একটীও কথা বলে নাই।

কিন্তু ট্রেণ আসিতে তখনও বহু বিলম্ব ছিল।

নিমাই খানিকটা এদিক-ওদিক ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, "জগন্নাথের দরজায় এসে চোখ বুজেই ফিরলে বউদি, তাঁকে দেখে জন্ম সার্থক করে গেলে না? তোমাদের মেয়েদের মধ্যে এ-রকম ভাব হওয়াই যে আশ্চর্য্য,—শুনেছি জগন্নাথ দেখবার জন্যে তোমাদের মেয়েরাই স্বামী পুত্রের মায়া কাটিয়ে ছুটে আসত—এখনও আসে।"

শুষ্ক হাসিয়া কল্যাণী বলিল, "হ্যাঁ এখনও আসে, এ দৃশ্য আমাদের দেশে বিরল নয়। এখন ঠাকুর কোথায় দেখব ঠাকুর-পো, পাথরের দেবতার দরজা যে বন্ধ হয়ে গেছে।"

নিমাই বলিল, "চেষ্টা করলে খোলা পাওয়া যেত।"

কল্যাণী মুখ ফিরাইয়া বলিল, "দরকার নেই।"

নিমাই বলিল, "কেন? ডাকলে দরজা খুলবে না—তোমার প্রবৃত্তি নেই?"

কল্যাণী বলিল, "অনেক টাকা দিলে হয়তো দরজা খুলে দেখতে দিলেও দিতে পারে, কিন্তু প্রবৃত্তি আমার নেই। দরজায় যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তার উপযুক্ত শক্তি আমার নেই ঠাকুর-পো, আমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, এখন বিশ্রাম চাই।"

একটু সময় নীরব থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল, "দেবতা সে দেবতাই। পাষাণের আবরণের মধ্যে যদি প্রাণ থাকে, ওই আবরণের বাইরের ডাক কি তা ভেদ করতে পারবে, সে প্রাণ কি বিগলিত করতে পারবে? জগন্নাথের পাথরের মূর্ত্তি দেখে পূজো দিয়ে আমি কতটুকু লাভ করব ঠাকুর-পো? নিজের ভাগ্যে—কিন্তু কোন সময়ের জন্যে চাইব? ইহকালের জন্যে না পরকালের জন্যে ভাবব? ইহকালে যা পেলুম এই আমার পর্য্যাপ্ত পাওয়া। মুক্তকণ্ঠে বলছি ঢের পেয়েছি, এর বেশী আরও যদি দিতে চাও—দাও, আমি সব বোঝা বইব, ভেঙ্গে পড়ব না। আর পরকাল? সত্যি বল দেখি ঠাকুর-পো, পরকাল আছে কি? চিরদিন বলে এসেছি পরকাল আছে, এ জন্মেই আমার সব কিছু ফুরিয়ে যাবে না, এর পরের জন্মে আমার এ জন্মের ব্যর্থতা সফলতায় ভরে যাবে। আজ এই মুহূর্ত্ত হতে জেনে নিলুম—মানুষের ইহজন্মই আছে, পরজন্ম নেই;—যে সেই পর-জন্মের আশায় দিন কাটিয়ে যেতে চায়, এ জন্মটাকে দুঃখের মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে গিয়ে পরজন্মের কল্পিত চিন্তায় প্রফুল্ল হয়ে ওঠে—সে মূর্খ, মহামূর্খ। স্বর্গ নরক মিছে কথা ঠাকুর-পো, স্বর্গ নরক্ নেই, দেবতা নেই, ও-সব নিছক কল্পনামাত্র।"

যে চিরকাল একনিষ্ঠ ভাবে দেবসেবা করিয়া আসিয়াছে, স্বর্গ নরকের পাপ-পুণ্যের হিসাব যে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্তে রাখিয়া আসিয়াছে, সে আজ বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়াছে। কালাপাহাড় একদিন একনিষ্ঠতার সঙ্গেই নিজের ধর্ম্মপালন করিয়া গিয়াছিল। সেদিন কেহই কল্পনা করিতে পারে নাই—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-সন্তান একদিনে হঠাৎ কালাপাহাড় হইয়া যাইবে।

কল্যাণীও বড় আঘাতের বেদনা পাইয়াই জোর করিয়া বিশ্বাস করিতে চায়—বিশ্বাস করাইতে চায়, দেবতা নাই, মানুষের ইহকাল আছে পরকাল নাই, স্বর্গ নরক, পাপ পুণ্যের অস্তিত্ব সে আজ অস্বীকার করে।

নিমাই সত্যই একটু আঘাত পাইল; বলিল, "কিন্তু হঠাৎই এতটা নাস্তিক হয়ে উঠলে বউদি? তোমাদের শাস্ত্রে বলে—"

দৃপ্তকণ্ঠে কল্যাণী বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, আমাদের শাস্ত্র অনেক কথাই বলেছে, বল্‌ছেও, কিন্তু সে সবই কি মানুষে মেনে চলতে পারে ঠাকুর-পো? শাস্ত্র উপদেশ দেয়, অনেক নজিরই সে দেখিয়েছে। শুনেছি একজন লোকের কুষ্ঠব্যাধি হয়েছিল, তার পতিব্রতা স্ত্রী সেই স্বামীর পাপকামনা চরিতার্থ কর্‌বার জন্যে তাকে বুকে করে তুলে নিয়ে গণিকার বাড়ীও গিয়েছিল। আমাদের শাস্ত্র এই রকম লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত দিয়ে গেছে; কিন্তু সত্যি করে বল দেখি ঠাকুর-পো, বাস্তবে কয়টী মেয়ে এ-রকম করে পাতিব্রত্যের দৃষ্টান্ত মেনে চলতে পারে?"

নিমাই একটু ভাবিয়া বলিল, "কিন্তু আমার কি মনে হয় জানো বউদি, হয় তো সত্যই এ-রকম কিছু ঘটেছিল; নইলে শাস্ত্রকারেরা পুঁথির পাতে লিখে রেখে যেতে পার্‌ত না। মেয়েরা যে ভালোবেসে সব কিছুই করতে পারে তা মানো তো? যে মেয়েটী তার কুষ্ঠাক্রান্ত স্বামীকে বুকে ধরে গণিকার বাড়ী নিয়ে গিয়েছিল, তার সেই প্রবৃত্তির মূলে গভীর ভালোবাসাই যে ছিল, এ-কথা অস্বীকার করা চলে না।"

কল্যাণী উত্তর না দিয়া অন্যদিকে তাকাইয়া রহিল।

আন্তরিক ভালোবাসা কথাটা হয় তো খুবই সত্য, কিন্তু এই প্রকৃত ভালোবাসাই যে নাই।

কল্যাণীও তো একদিন ভাবিয়াছিল, সে তাহার স্বামীকে আন্তরিক

ভালোবাসে ; তাহার এ ভালোবাসা কোনোদিন শিথিল হইবে না বলিয়াই তাহার বিশ্বাস ছিল। আজ নিমাইয়ের কথায় অত্যন্ত সচকিত হইয়াই সে নিজের অন্তর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, কিন্তু সেখানে প্রতিহিংসার দুর্দ্দমনীয় কামনা ছাড়া আর কিছুই নাই। আঘাত দিয়া সে আঘাত পাওয়ার বেদনা ভুলিতে চায়, ঘরের কোণে পড়িয়া মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে সে চায় না।

নিমাই টিকেট কাটিতে চলিয়া গেল।

খানিক পরে সে যখন ফিরিয়া আসিল কল্যাণী জিজ্ঞাসা করিল, "কোথাকার টিকেট করলে ঠাকুর-পো ?"

নিমাই বলিল, "উপস্থিত কলকাতার টিকেট করে আনলুম, তারপর ওখান হতে দেশের টিকেট করা যাবে।"

কল্যাণী মাথা নাড়িল, বলিল, "কিন্তু আমি তো আর দেশে ফিরব না, বাড়ীতে যাব না।"

নিমাই যেন আকাশ হইতে পড়িল, "বাড়ী যাবে না কি রকম ?"

কল্যাণী অধর দংশন করিয়া বলিল, "বাড়ী যাব—কার বাড়ীতে আমি যাব—বাস করব বল দেখি ? যে কেবলমাত্র আমায় বিয়ে করে আমার জীবনটা ব্যর্থতায় ভরে দিয়ে, স্ত্রীর কর্ত্তব্য পালন করতে রেখে নিজে সরে গেছে, তারই বাড়ীতে যাব ? দিনের পর দিন তার ঘর বাড়ী পাহারা দেব, পরিষ্কার করব—একা দুঃখময় জীবনটা কাটিয়ে দেব—সে আমি পারব না, কিছুতেই না।"

নিমাই তাহার মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় থাকবে ?"

কল্যাণী সোজা উত্তর দিল, "তোমার বাড়ীতে—"

"আমার বাড়ীতে—?

নিমাইয়ের মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল, সে নিস্তব্ধে কেবল কল্যাণীর পানে তাকাইয়া রহিল।

কল্যাণী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "এ কথা শুনে তোমারই বা এত ভয় হল কেন ঠাকুর-পো? তোমার বাড়ী আমি থাকতে চাচ্ছি শুনেই তোমার মুখখানা সাদা হয়ে গেল, এতে তোমার কিসে বাধছে বলতে পারো? কিন্তু এ কথা তো অস্বীকার করা চলবে না ঠাকুর-পো, তুমি দিনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় আমার কাছে থাকতে চাও, অনেক লোকে এ জন্যে তোমায় অনেক কথাই বলেছে; কিন্তু একটা কথাও তুমি কানে নাওনি। এই যে বাড়ী ঘর মা ছেড়ে কেবল আমার সঙ্গলাভের জন্যই আমার সঙ্গে এসেছ, এ সত্য আজ তুমি অস্বীকার করতে চাইলেও আমি তো তা মানব না ঠাকুর-পো। আমি যা লক্ষ্য করেছি সেগুলো কি কেবল বাইরের, ওর মধ্যে তোমার অন্তরের আকর্ষণ এতটুকু নেই? আজ তোমার বাড়ীতে গিয়ে থাকতে চাই শুনে তুমি শিউরে উঠলে, কিন্তু সত্যি করে বল দেখি, তোমার অন্তরের অন্তরালে আমায় তোমার কাছে পাওয়ার কামনাটাই জাগছে নাকি?"

নিমাই স্তম্ভিতভাবে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল; ধীরকণ্ঠে বলিল, "হয়তো হয়েছিল বউদি কিন্তু—"

কল্যাণী শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "হঠাৎ মনের ভাবটা বদলে গেছে—কেমন? নাঃ, দেখছি সত্যিই তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য আছে, যাতে অতি বড় মহাপাপীর মনের গতিও বদলে যায়। একদিন যাকে নিজের কাছে পেতে চেয়েছিলে, আজ তাকে হাতের কাছে পেয়েও ঠেলে দিতে চাচ্ছো, এ কি কেবল তীর্থস্থানের মাহাত্ম্যেই নয় কি?"

নিমাই বলিল, "তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য আছে কি না তা জানি নে, তবে মানুষের মনে যে বিরাট দৌর্ব্বল্য আছে এ কথা স্বীকার করব। তোমায় একদিন খুব কাছেই পেতে চেয়েছিলুম—সেদিন তোমায় পাওয়া দুরূহ বলেই জানতুম। তবু বলি বউদি, কি রকম ভাবে যে পেতে চেয়েছিলুম তা, আমি আজও ভেবে ঠিক করতে পারি নি। তোমার কাছে যাওয়ার, তোমার কাছে থাকার, কথা বলার একটা অদম্য স্পৃহা আমার মধ্যে আছে,—হয়তো তোমায় পরস্ত্রী বলেও ভাবিনি, কেন না জয়ের নেশা মানুষকে পাগল করে। কিন্তু জয় যখন স্বতঃই হয়ে যায়, যুদ্ধের আয়োজনই হয় মাত্র, তখন মানুষ শক্তিহীন হয়ে পড়ে, আগেকার উদ্যম আর থাকে না, এ কথা তুমি মানবে তো বউদি।"

কল্যাণী বলিল, "বুঝেছি, উদ্যোগপর্ব্বেই জয়লাভ করেছ, তুমি তাই আজ উদ্যমহীন; তোমার মধ্যে আর স্পৃহা নেই, সেইজন্যেই তোমার বাড়ীতে তোমার কাছে আমায় রাখতে তুমি ভয় পাচ্ছ।"

নিমাই হাসিতে গেল, "ভয়? ভয় নয় তবে—"

কল্যাণী বলিল, "সংস্কারে বাধছে বল?"

নিমাই তাহার মুখের উপর দৃষ্টি রাখিয়া উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি আমায় পরীক্ষা করছো বউদি?"

বিস্মিত হইয়া গিয়া কল্যাণী বলিল, "কিসের পরীক্ষা তোমায় করব ঠাকুর-পো?"

নিমাই বলিল, "তুমি প্রথম হতেই আমার আচরণগুলো লক্ষ্য করেছ, আমার দৌর্ব্বল্য কোন্‌খানে তা তুমি সহজেই ধরতে পেরেছ, আর সেই ছিদ্রগুলো পেয়েই তুমি আজ একটা মতলব গড়ে তাতে সাহায্য করতে আমায় ধরেছ। কিন্তু বউদি, তোমার কথা তুমি বলেছ, আমার কথা

এবার শোন। মানুষ ভালোবাসে হয় তো অনেককেই, অথচ অনেকেই প্রথমে বুঝতে পারে না সে কি রকম ভালোবাসে, তাদের ভালোবাসার পাত্র বা পাত্রীদের কি রকম ভাবে পেতে চায়। এর মীমাংসা হয় দিন কত পরে যখন ভালোবাসার তরলতা ঘুচে যায়, সেটা জমাট হয়ে আসে ;—তখনই একটা সম্পর্ক গড়ে নেওয়ার জন্যে মানুষ অধীর হয়ে ওঠে। দেহের দাবীর কথা বলবে—কিন্তু ও তো পুরানো হয়ে গেছে বউদি। মানুষ সৃষ্টির আদিম যুগ হতে দেহের উপর রাজত্ব করে আসছে, দেহের তৃপ্তিই একমাত্র কাম্য জিনিস বলে জানছে। আজও যদি আমরা তাদেরই মত কেবলমাত্র দেহ উপভোগ করাটাকেই একমাত্র কাম্য বলে সকলের উপরে স্থান দেই, তাহলে তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও মেনে নিতে হবে—আজ সেই সব অসভ্যদের তুলনায় অনেক উপরে স্থান পেয়েও আমরা সভ্য শিক্ষিত নই, আমরা এক পা এগিয়ে যেতে পারি নি, ঠিক সেই জায়গাতেই রয়ে গেছি। চোখের সামনে যে সব নিকৃষ্ট প্রাণীদের দেখতে পাই—যারা কেবলমাত্র দৈহিক আকর্ষণে পরস্পরের কাছে আসে, আমরা নিজেদের ওদের চেয়ে মহৎ বলে ধারণা করলেও দেখতে পাই—ঠিক ওদেরই পর্য্যায়ে পড়ে আছি। ওদেরই মত আমাদের কাজ দৈহিক তৃপ্তিসাধন, বংশ-বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছুই নয়। সৃষ্টির আদিম যুগে যখন কেবল সৃষ্টির প্রয়োজন হয়েছিল, তখন এ আচরণ মন্দ চলে নি ; কিন্তু আজ যখন আমরা দেখতে পাই বংশ-বৃদ্ধি করে কেবল পৃথিবীতে কতকগুলো দরিদ্র রুগ্ন পরিবারই রেখে যাচ্ছি, তখন সাবধান হওয়াই ভালো বই কি। তখন আমরা বেশী ভাবতে শিখি নি, ভবিষ্যতে আমাদের চোখ যায় নি, আমরা বর্ত্তমান জগৎটাকে মেনে চলতুম। দেহের সম্পর্ক ছাড়া আবার যে প্রীতিকর সম্পর্ক থাকতে পারে, সে কথা আজ যেমন জেনেছি সেদিন

জানি নি, সেদিন বুঝিনি উপভোগে আসক্তি, তৃষ্ণা কমে না, আরও বাড়ে। আজ আমায় সত্যিকার জয়লাভ করতে দাও বউদি, দৈহিক ঘৃণিত সম্পর্কের কথা ভুলে যেতে দাও; এসো—আমরা একটা নূতন সম্পর্ক সৃষ্টি করি। তুমি আমার মা হও, আমি মনে প্রাণে তোমার সন্তান হই। এতে তুমিও রক্ষা পাবে, আমিও পাব, আমরা পবিত্র নির্ম্মল যোজক। তুমি আমার বোন হও, আমি তোমার ভাই হই, নিঃসঙ্কোচে আমি তোমার পরিচয় সকলের কাছে দিয়ে তোমায় বাড়ী নিয়ে যাই। আমায় পরীক্ষা করছ কর, আশীর্ব্বাদ কর—যেন উত্তীর্ণ হতে পারি।"

কল্যাণী নির্ব্বাকে শুধু নিমাইয়ের পানে তাকাইয়া রহিল। নিমাই কথা শেষ করিয়া একটী কোন কথা শুনিবার প্রত্যাশায় তাহার পানে তাকাইয়া রহিল, কিন্তু কল্যাণী উত্তর দিল না। নিমাইয়ের কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে মাথা নীচু করিল।

সংশয়ে নিমাইয়ের বুক দুলিতেছিল—এ নারী কি চায়?

খানিক পরে কল্যাণী মুখ তুলিল ধীরকণ্ঠে বলিল, "কলকাতায় চল ঠাকুরপো। তুমি আমার সঙ্গে যে সম্পর্কই পাতাও—জেনো—আমি ওখানেই থাকব—দেশে আর ফিরব না। উপস্থিত তোমার বাড়ীতে আমায় দু'দিনের জন্যে স্থান দাও, তারপরে নিজের জায়গা নিজে দেখে নেব।"

ট্রেণ আসিবার সময় হইয়াছিল, উভয়েই প্রস্তুত হইল।

দিনের পর চলিয়া যাইতেছে, কল্যাণী বা বিশ্বপতির কোনও উদ্দেশ নাই,—সনাতন ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

এদিকে কেমন করিয়া গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল—কল্যাণী নিমাইয়ের সহিত পুরীতে গিয়াছিল; কিন্তু সেখানে এক-রাত্রিও থাকে নাই; সে যেমন গিয়াছিল তেমনই ফিরিয়াছে; কোথায় গিয়াছে সে সংবাদ কেহই জানে না।

কথাটা সনাতন বিশ্বাস করিতে পারে না।

এ কথা কখনও বিশ্বাস করিতে পারা যায়? গ্রামের লোকে কল্যাণীর পরিচয় পাইয়াছে কতটুক? তাহারা কল্যাণীকে দেখিয়াছে মাত্র, আসল মানুষটাকে চিনিতে পারে নাই! তাহারা এ কথা বিশ্বাস করিবে; কেন না, প্রকৃতিই তাহাদের ঐরূপ। শূন্যে ছায়া গড়িয়া তাহাই লইয়া একটা বিরাট মূর্ত্তি কল্পনায় গড়িয়া তোলা লোকের স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস, মিথ্যা কথা সাজাইয়া মালা গাঁথিতে তাহারা সিদ্ধহস্ত।

সনাতন কল্যাণীকে চেনে। কেবল বাহিরের মানুষটার নয়, তাহার অন্তরে যে রহিয়াছে তাহার পরিচয় সনাতন পাইয়াছে। সনাতন জানে কল্যাণী তেমন মেয়ে নয় যে এত সহজে পথ হারাইয়া ফেলিবে।

শ্রীরূপ পুরী হইতে সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়াছে। সে-ই এই ব্যাপারটা গ্রামে রাষ্ট্র করিয়াছিল। একদিন পথ চলিতে তাহাকে দেখিতে পাইয়া

সনাতন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কথাটা কি বাস্তবিক? মা লক্ষ্মী কি ফিরিয়া আসিয়াছে, না বিশ্বপতির কাছেই আছে?

শ্রীরূপ জানাইল—সত্যই কল্যাণী যেদিন পুরীতে গিয়াছিল সেইদিনই বৈকালের দিকে চলিয়া আসিয়াছে। সে বাড়ীতে বড় জোর দুই তিন ঘণ্টা মাত্র ছিল। বাড়ীর ভিতর কি ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহা সে জানে না; তবে কল্যাণী হঠাৎ চলিয়া আসায় বাড়ীর সকলেই যেমন বিস্মিত হইয়াছিল, সেও তাহার চেয়ে বড় কম হয় নাই। কারণ অনুসন্ধান করিয়া গোপনে সে জানিতে পারিয়াছে নিমাইবাবুর সঙ্গে বিশ্বপতিকে দেখিতে যাওয়ায় বিশ্বপতি মোটেই খুসি হইতে পারে নাই এবং সেইজন্যই সে কল্যাণীকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়াছে; নিমাইবাবুকেও অপমান করিতে ছাড়ে নাই। বিশ্বপতি কল্যাণীকে তৎক্ষণাৎ পুরী ত্যাগ করিবার আদেশ দিয়াছিল,—গ্রামের বাড়ীতে যেন না ফিরিয়া আসে সেজন্য আদেশ দিয়াছিল। সেইজন্যই কল্যাণী গ্রামে ফিরে নাই, আর আসিবেও না।

সনাতন বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর কম্পিত শ্লথপদে বাড়ীর দিকে ফিরিল।

অভাগিনী নারী এমনই করিয়া না অত্যাচার লাঞ্ছনা সয়?

হতভাগ্য বিশ্বপতি,—

এমন রত্ন সে চিনিল না! কাচ লইয়া সে ভুলিয়া রহিল, মহামূল্য হীরক পদাঘাতে দূরে ফেলিয়া দিল!

নিমাইয়ের সঙ্গে সে পুরী গিয়াছে এইমাত্র তাহার অপরাধ, এ ছাড়া আর কোন অপরাধ তো সে করে নাই! প্রিয়জন যদি দূরদেশে থাকিয়া সঙ্কটাপন্ন ব্যারামে পড়ে, কেহই স্থির থাকিতে পারে না।

বিশ্বপতি ধরিয়া লইয়াছে অন্য রকম। সে নিমাইকে অন্য রূপ ভাবিয়াছে, কল্যাণীকে ভুল বুঝিয়াছে। কল্যাণীর নির্ম্মল পবিত্র চরিত্রে সে কলঙ্কের রেখা আঁকিয়া দিয়াছে, স্পষ্টই অপমান করিয়াছে।

সে ধারণাও করিতে পারে নাই—স্বামীর সঙ্কটাপন্ন ব্যারামের খবর পাইয়া স্ত্রী হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে যে এ জন্য জবাবদিহী করিতে হইবে তাহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই।

এমনই মিথ্যা সন্দেহ করিয়াই না পুরুষরা মেয়েদের ধ্বংসের পথে নামাইয়া দেয়, তাহাদের আত্মহত্যা করিবার প্রবৃত্তি জাগাইয়া দেয়? এই যে দারুণ অপমানে মর্ম্মাহতা কল্যাণী চলিয়া গেছে,—কে জানে সে কোথায়, কে জানে সে বাঁচিয়া আছে কি না? যদি আত্মহত্যা করিবার সাহস তাহার না হয়, তাহা হইলে তাহার পরিণাম কি হইবে, তাহা ভাবিতেও বৃদ্ধ সনাতন শিহরিয়া উঠে।

কিন্তু তাহাও কি সম্ভব হইতে পারে? দুনিয়ায় প্রলোভন অনেক আছে; কিন্তু সেই প্রলোভনে পড়িয়া আপনার সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিবে, কল্যাণী তেমন মেয়ে নয়। অধঃপাতে যাওয়া লোকে যত সোজা বলিয়া মনে করে, সত্যই তত সোজা নয়।

তথাপি সনাতন অস্থির হইয়া উঠিল। কল্যাণীর নামে লোকে যে এত কথা বলিতেছে, তাহা সে সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, কল্যাণীর এ গৃহত্যাগ করিয়া আর কোথাও স্বচ্ছন্দে বাস করার সংবাদ পাইবার পরিবর্ত্তে মৃত্যু সংবাদ পাইলেই ভালো হয়। সে কাঁদিবে, কষ্ট পাইবে, তবুও সগর্ব্বে সকলকে জানাইবে—তাহারা যাহা বলিতেছে তাহা মিথ্যা, তাহার মা-লক্ষ্মী নিজের পবিত্রতা বাঁচাইতে আত্মবলি দিয়া বিজিতার গৌরব লাভ করিয়াছে।

সনাতন ভাবিতে লাগিল, সে এখন কি করিবে। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে বিশ্বপতিকে একখানা পত্র দেওয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করিল।

বহুকাল পরে সে সেদিন খুঁজিয়া খুঁজিয়া দোয়াত, কলম ও কাগজ লইয়া পত্র লিখিতে বসিল।

এক লাইন লিখিতে দশটা ভুল হয়, "ক" লিখিতে "ল" লিখিয়া বসে; কোন্ লাইনটা কাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে গেলে অক্ষর যোজনা করা চলে না। তবু যেমন তেমন করিয়া পত্রখানা শেষ করিয়া সে সেই দিনই নিজের হাতে পোষ্ট অফিসে দিয়া আসিল।

পত্রে সে কল্যাণীর সম্বন্ধে কোন কথাই লিখিল না, কেবল লিখিল বিশ্বপতির শীঘ্র ফিরিয়া আসা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তাহার শরীর অসুস্থ, সেই জন্য কিছু দিন সে মেয়ের নিকট যাইবে। এখানকার জমিজমা বাগান ও বাড়ী কাহার ভরসায় রাখিয়া যায় তাহাই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছে না।

পত্র পাঠাইয়া সে উত্তরের আশায় পথপানে তাকাইয়া রহিল। তাহার দৌরাত্ম্যে পোষ্টম্যানের পথ-চলা দুষ্কর হইয়া উঠিল। প্রত্যহই সে পথের ধারে পোষ্টম্যানের প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া থাকে, আকাঙ্ক্ষিত লোকটীকে দেখিয়াই নিকটে ছুটীয়া যায়, ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করে—"বাবুর পত্র আছে—আমার নামের পত্র?"

গ্রামের ছেলেই পোষ্টম্যানের কাজ করে, সে উত্তর দেয় "পত্র নাই।"

অনুনয়ের সুরে সনাতন বলে, "তবু দেখ না ভাই একবার, ওর মধ্যে যদি থাকে—"

পোষ্টম্যান তাহার অন্তরের আকুলতা বুঝে না; তবুও সময় নষ্ট করিয়া

খানিক দাঁড়াইয়া হাতের সমস্ত পত্রগুলা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে, তাহার পর উত্তর দেয়—"না দাদা, পত্র আসে নি।"

হতাশ ভাবে ফিরিয়া আসিয়া সনাতন বারাণ্ডায় বসিয়া পড়ে। দিন গণিয়া হিসাব করে কত দিন পত্র দেওয়া হইয়াছে। এই তো কাছেই পুরী,—পত্র যাইতে বড় জোর না হয় চার দিনই লাগে, আসিতেও চার দিন লাগে। কিন্তু কত আট দিন অতীত হইয়া গেল, আজও তো পত্রের জবাব আসিল না।

অবশেষে সত্যই একদিন ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল; পোষ্টম্যান হাসিমুখে একখানি কার্ড দিল। তাহাতে সামান্য দুচার লাইন লেখা,—এই ভাদ্র মাসের কয়টা দিন পরেই বিশ্বপতি আসিতেছে, সনাতন যেন আর কয়টা দিন অপেক্ষা করে।

সনাতন একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। তাহা হইলে বিশু আসিতেছে,—আর বেশী দিন সে পুরীতে থাকিবে না।

পত্রখানা সে সযত্নে রান্নাঘরের চালের বাতায় গুঁজিয়া রাখিল।

বাড়ী ফিরিবার জন্ম বিশ্বপতি ছট্‌ফট করিতেছিল, পুরী তাহার আর ভালো লাগিতেছিল না।

সেদিনে শ্রাবণের মেঘভরা একটী দিনে যে আসিয়াছিল, ক্ষণেকের দেখা দিয়া শান্তির পরিবর্তে অশান্তি লইয়াই সে চলিয়া গেছে,—অহোরাত্র কেবল তাহার কথাটাই মনে জাগিতেছিল।

কতখানি আশা লইয়াই সে আসিয়াছিল; আর কি নিদারুণ অভিমান ও বেদনা লইয়া সে চলিয়া গেছে। সে বিশ্বপতির কাছে একটী কথাও বলে নাই, একটীবার মাত্র যে চোখ দু'টি তুলিয়াছিল তাহাতেই মনের ভাষা ব্যক্ত হইয়া গেছে।

সে আর একটীবার বিশ্বপতির পানে ফিরিয়া চায় নাই, সোজা গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছিল।

নিজের মনের ব্যথা প্রকাশ করিবার জন্ম সে অধীর ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু নন্দার মুখের পানে তাকাইয়া সে একটী কথাও বলিতে পারে নাই। সমস্ত দিনটা নন্দার মুখে একটী কথা শুনিতে পাওয়া যায় নাই, অথচ নীরবে সে নিজের সব কাজই করিয়া গেছে। কতবার বিশ্বপতির সম্মুখে আসিয়াছে, তাহাকে খাওয়াইয়াছে, ঔষধ নিয়মিত ভাবেই নিজের হাতে ঢালিয়া দিয়াছে, অথচ কোন কথাই হয় নাই। সন্ধ্যার পর সে বিশ্বপতির নিকটে আসিয়া বসিল, আবার প্রতিদিনকার মত গল্প জুড়িয়া দিল। এই গল্পের ফাঁকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া

বলিল, "বউদির জন্যে আজ তোমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে—না বিশুদা ?"

অকস্মাৎ চমকাইয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিয়া বিশ্বপতি বলিল, "দূর, তাই কি, —সত্যি নন্দা, তার জন্যে আমার—"

খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া নন্দা বলিল, "বিলক্ষণ, তোমার কাছে আমি কি কৈফিয়ৎ চাচ্ছি বিশুদা,—ওর জন্যে তোমায় আর দিব্যি করতে হবে না। স্ত্রীর এ রকমভাবে হঠাৎ চলে যাওয়ায় স্বামীর মনে নিদারুণ কষ্ট হয় না, এ কথা বললে আমি শুনব না।"

অতিরিক্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বিশ্বপতি বলিল, "না না সত্যি তুমি বিশ্বাস কর নন্দা, রাঙা-বউকে সত্যিই আমি ঠিক অন্তরের সঙ্গে নিতে পারি নি। অথচ তুমি তো দেখেছ নন্দা—রূপ তার যথেষ্ট আছে, লেখাপড়া বেশী না জানুক—তবু গুণ তার যথেষ্ট আছে। ও যদি না আসত আমি কোথায় ভেসে চলে যেতুম তার ঠিক নেই। ও ছিল বলেই আমি আজও গৃহী,—আজও ছন্নছাড়া হইনি। যেথানে যখন গেছি—একেবারে ভেসে যেতে পারি নি, নিজের অস্তিত্ব একেবারে বিলীন করতে পারিনি, ওর কথা মনে করে আবার ফিরে এসেছি। কিন্তু তবু—তবু নন্দা, সত্যি কথাই বলছি আমি ওকে সত্যি নিজের বলে নিতে পারি নি, ওকে ভালোবাসতে পারি নি। যেটুকু করেছি সে যেন কেবল কর্ত্তব্যের দায়ে। ও যে তা বোঝে নি তা নয়,—দেখলে না—আমার একটী মাত্র কথায় কি রকম করে চলে গেল, আর একটীবার পেছন ফিরে চাইলে না, আমি যা বললাম সে কথাটা বুঝবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করলে না! এতে তুমি মনে করবে রাঙা-বউ বোকা,—তা নয়,—সে অনেক বুদ্ধি ধরে তা জেনে রেখো।"

কল্যাণী যে বোকা নয় তাহা নন্দা অন্তরে অন্তরে বেশ বুঝিয়াছিল। যদি বিশ্বপতি বোকা বলিত তাহা হইলে সে প্রতিবাদ করিত, বিশ্বপতিও তাহার পরিচয় জানে জানিয়াই সে চুপ করিয়া গেল।

বিশ্বপতি ক্লান্তভাবে বিছানায় কাত হইয়া পড়িয়া বলিল, "হঠাৎ বিকেল হতে মাথাটা কি রকম ধরেছে, কিছুতেই নরম পড়ল না। ভেবেছিলুম গরমে মাথা ধরেছে, কিন্তু এখন তো বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে তবু—"

নন্দা বলিল, "হাত বুলিয়ে দেব ?"

বিশ্বপতি বলিল, "দাও।"

নিস্তব্ধে সে পড়িয়া রহিল, নিস্তব্ধে নন্দা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

নন্দা ইহার পর কল্যাণীর সম্বন্ধে আর একটী কথাও তুলিল না, বিশ্বপতিও যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়া গেল। তাহার মনে কেবল ভয় হইতেছিল নন্দা কখন কি খোঁচা দেয়, কখন কি কথা বলিয়া বসে।

বাড়ী ফিরিবার জন্য মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন বাড়ী ফেরার কথা মুখে আনিবামাত্র নন্দা প্রচণ্ড এক ধমক দিয়া বলিল, "তাই বল যে বউদির জন্যে মন কেমন করছে। তবে কোন্‌মুখে সেদিনে বললে বউদিকে ভালোবাস না,—আমি তাই ভাবছি। মাগো, তোমরা পুরুষ জাতটা এত মিথ্যে কথাও বলতে পারো।"

ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বিশ্বপতি বলিল, "আঃ, কি যে বল নন্দা, দেশে কেবল যেন আমার বউই আছে, বাড়ী ঘর জমিজমাগুলো সব ভেসে গেল আর কি। এই দেখ সনাতন পত্র দিয়েছে তার অসুখ—সে মেয়ের বাড়ী চলে যাবে, আমায় শীগ্‌গির যেতে বলেছে।"

পত্রখানার উপরে একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া নন্দা গম্ভীর মুখে মাথা নাড়িল, "উঁহু, তা বলে তোমার এখন যাওয়া হতে পারে না বিশুদা। এই সে দিন অত বড় ব্যারামটা হতে উঠলে, এখনও চেহারা ফেরে নি, গায়ে জোর পাও নি, এখনই তোমায় পাঠাই আর কি? ও সব কথা রাখ, আসল কথা বল যে দেশে না গেলে তোমার সুবিধা হচ্ছে না। এখানে যে তোমার নেশা চলছে না,—দেশে না গেলে ও সব ছাই ভস্ম খাওয়ার সুবিধা হবে কেন?"

বিবর্ণ হইয়া বিশ্বপতি বলিল, "ছিঃ, ছিঃ, তুমি ও-সব কথা কি বলছ নন্দা? তোমার হয়েছে কি বল দেখি? যা মনে আসছে তাই মুখ ফুটে বলে যাচ্ছো? একটু ভেবে চিন্তে বিবেচনা করে কথা বললেই ভালো হয় না কি?"

চাপা হাসি হাসিয়া নন্দা বলিল, "অত ভেবে কথা বলবার মত ধৈর্য্য আমার নাই বিশুদা। কিন্তু আমার মনে ছিল না সত্যিই তুমি পৈতে পুড়িয়ে ভগবান হয়েছ। তা যদি হয়ে থাকো তা হলে সত্যিই কপালের জোর বলতে হবে, কি বল। যাক, তুমি সনাতনকে একখানা পত্র লিখে দাও—এ মাসের এ কয়টা দিন যাক। আশ্বিনের দশই আমাদের যাওয়ার দিন ঠিক করে উনি পত্র দিয়েছেন। তার আগেই উনি আসবেন, আমরা একসঙ্গেই যাব। কলকাতা হতে তুমি সহজেই বাড়ী চলে যেতে পারবে। আর এই কয়টা দিন মাঝখানে বই তো নয়, দেখতে দেখতে কেটে যাবে।"

বাড়ীর দিকে মনটা অহোরাত্র টানিলেও বিশ্বপতি মুখ ফুটিয়া আর একটী কথাও বলিতে পারিল না। সেই দিনই একখানা কার্ডে সনাতনকে পত্র লিখিয়া সেখানা নন্দার হাতে দিয়া বলিল, "পড়ে দেখ।"

নন্দা হাতের মধ্যে পত্রখানা লইয়া উদাসীন ভাবে বলিল, "না, সত্যি, তোমার মন যদি একান্তভাবে টেনেই থাকে, তুমি অনায়াসে চলে যেতে পারো বিশুদা,—এর পরে যে আমার নামে দোষ দেবে আমিই তোমায় যেতে দেইনি—"

অত্যন্ত কাতর হইয়া হাত দু'খানা যোড় করিয়া বিশ্বপতি বলিল, "মাফ কর নন্দা, কেটে কেটে আর নুন দিয়ো না। যদি জানতে এর জ্বালা কি রকম তা হলে এ রকম করে কাটা ঘায়ে নুন দিতে পারতে না।"

নন্দা কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। কথাটা ফিরাইয়া লইয়া বলিল, "দেশে তো যাবে,—সেখানে গিয়ে যদি শরীরের দিকে নজর না দাও, জানছো তার পরিণাম কি হবে?"

বিশ্বপতি বলিল, "তুমি দেখে নিয়ো আমি শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখি কি না। কার্ত্তিক মাসে একবার তোমার ওখানে যাব, গেলেই দেখতে পাবে।"

নন্দা গম্ভীর মুখে বলিল, "দেখা যাবে। বেশী দূরের পথ তো নয়, যদি নাই এসো—আমি নিজেই যাব দেখতে।"

পত্রখানা দাসীর হাতে দিয়া সে পোষ্ট করিতে পাঠাইয়া দিল।

দিনগুলা যেন কাটিতে চায় না। পুরীর দৃশ্য একঘেয়ে হইয়া গিয়াছে সমুদ্র দেখিতে আর ভালো লাগে না। কিছুর মধ্যেই আর বৈচিত্র্য নাই।

অথচ একদিন এই সব দেখিতেই বড় ভালো লাগিত। বিশ্বপতি সমুদ্রের ঢেউ দেখিতে ছুটিয়া যাইত। সাগরে সূর্য্যোদয় দেখা তাহার কাছে বড় লোভনীয় ছিল। আকাশে যখন মেঘ সাজিয়া আসিত, কালো জলের উপরে কালো মেঘের ঢেউ খেলিত, আশ্চর্য্য হইয়া সে তখন তাকাইয়া থাকিত।

জগন্নাথের মন্দিরে নিত্য কত লোক আসা যাওয়া করিত, বিশ্বপতি প্রত্যহ তাহা দেখিতে যাইত।

এখন সে আর দেখিতে যায় না, দেখিতে ভালোও লাগে না। বিশ্বপতি এখন দেশের কথাই ভাবে।

ক্ষুদ্র গ্রাম, জনাকীর্ণ সহরের তুলনায় সে কত পিছনে—কি নিবিড় অন্ধকারেই ডুবিয়া আছে। তবু সেখানে যা আছে আর কোথাও তাহা নাই। অসুখ হইতে উঠিয়াই সে কল্যাণীকে একখানা পত্র দিয়াছিল, এত কালের মধ্যে তাহার জবাব আসিল না। কল্যাণী রাগ করিয়া গিয়াছে, সে হয় তো উত্তরও দিবে না। বিশ্বপতি অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া পত্র দিয়াছে, রোগের সময় তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছিল, সেই জন্যই সে কল্যাণীকে অমন কটু কথা বলিয়াছিল, ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিশ্বপতি বেশ বুঝিতেছিল অভিমানিনী কল্যাণী সে অপমান ভুলিতে পারে নাই, ভুলিতেও পারিবে না। তাহার নিকট হইতে এত দূরে

থাকিয়া বিশ্বপতি যে কোনো দিনই ক্ষমা পাইবে না, ইহা জানিত সত্য কথা। নিকটে গিয়া পড়িলে হয় তো ক্ষমা মিলিলেও মিলিতে পারে, দূর কেবল দুইয়ের মাঝখানে অধিকতর দূরত্বের ব্যবধানই জাগাইয়া রাখিবে।

সর্ব্বদাই তাহাকে চিন্তাকুল ও অন্যমনস্ক দেখিয়া নন্দা সেদিন আর স্থির থাকিতে পারিল না, স্পষ্ট বলিল, "তুমি বাড়ী চলে যাও বিশুদা, আমাদের এখনও যেতে দু পাঁচ দিন হয় তো দেরী হবে, তোমায় কেন আর বন্ধ করে রাখি। এ সময়টা গেলে তোমার ভাঙ্গা শরীর আরও বেশী ভেঙ্গে পড়বে বলেই যা আমার বাধা দেওয়া, নইলে আর কি? সত্যিই তো তুমি আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করবার জন্য এখানে থাকো নি, তোমার ভরসাতেই যে আমরা এই বিদেশে পড়ে আছি তাও নয়। আমার ঝি চাকর, পুরানো সরকার আছে, ওরাই আমাদের দেখাশুনা করতে পারবে। তুমি থাকলেও যা না থাকলেও তাই, তবে অনর্থক—"

সে কথাটা আর শেষ করিল না। বিশ্বপতি মুখখানা নত করিয়া রহিল, নন্দার কথার একটা উত্তর দিল না।

নন্দা তাহার নত মুখখানার পানে একবার তাকাইয়া বলিল, "আমি তা হলে আজই ওঁকে পত্র দেই তুমি যাচ্ছো। কলকাতায় নেমে ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করে যেয়ো অবশ্য করে। কবে যেতে চাও বিশুদা? শুক্রবারে দিন না কি ভালো আছে, সেই দিনই তা হলে যাও—কি বল?"

বিশ্বপতি মুখ তুলিল, তাহার মুখে বড় মলিন একটু হাসির রেখা—"আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি নন্দা, আমায় এ-রকম ভাবে বিঁধে তোমার কি সুখলাভ হয় বল তো? একটা জীবন্ত লোককে ধরে আগুনে পুড়িয়ে তোমার মনে কতখানি শান্তি হয়?"

উত্তরটা নন্দার মুখে আসিয়াছিল—তোমার মত লোককে বিঁধে শান্তি তৃপ্তি লাভ হয় বই কি! কিন্তু সে কথা সে চাপিয়া গেল। বলিল, "তোমায় বিঁধে আমার কোন লাভ নেই, শান্তিও নেই বিশুদা, আর এই কি বিঁধবার মত কথা? তুমি নিজেই বারুদের স্তূপ, একটুখানি আগুনের আঁচ সইবার ক্ষমতা তোমার নেই, লোকে কি করবে বল?"

খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা বিশুদা, আমার দিব্যি,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব—সত্যি উত্তর দেবে?"

বিশ্বপতি বলিল, "তোমার দিব্যি দেওয়ার কোন দরকার দেখছি নে, কেন না, দিব্যি না করেও এ পর্য্যন্ত যে মিছে কথা বলেছি তা আমার মনে হয় না। যা জিজ্ঞাসা করবে কর, উত্তর যা দেব তা সত্যিই দেব—যদিও জানি নে বিশ্বাস করবে কি না।"

নন্দা বলিল, "তুমি আগেও বলেছ, এখনও বল, বউদিকে কেবল কর্ত্তব্যের খাতিরেই দেখ—এই কি সত্যি কথা?"

বিশ্বপতি মুখ টিপিয়া একটু হাসিল মাত্র।

চিন্তিত মুখে নন্দা বলিল, "তবেই তো দেখছি ভাবিয়ে তুললে। আমি জানতুম মানুষের মন বড় উর্ব্বর, এখানে এতটুকু বীজ পড়বার অপেক্ষা মাত্র, বীজটি পড়বামাত্র গাছ জন্মায়। জানো—আমি ভালোবাসার কথা বলছি? আমি জানি ভালোবাসা অনেক রকমেই জন্মায়, যেমন উপকারীকে ভালোবাসা, বন্ধুকে ভালোবাসা, শুশ্রূষাকারিণীকে ভালোবাসা—"

বিশ্বপতি বাধা দিয়া বলিল, "আর দাসীকে ভালোবাসা, রাঁধুনীকে ভালোবাসা? বল বল, ও বেচারাদের কেন ছেড়ে দেবে,—ওদেরও নাম।"

হাসিয়া উঠিয়া নন্দা বলিল, "তাই বা মন্দ কি? যে ঝি কি রাঁধুনী

ঠিক মনের মত কাজ করে যায়, তাকে বুঝি মনিব ভালোবাসে না? তুমি কি বলতে চাও ভালোবাসা কেবল কর্ত্তব্যের জন্যেই, ওর বৈশিষ্ট্য কিছু নেই? আজকাল এ জিনিসটা কত সস্তা তা জানো? নিরেট মূর্খ, পড়ে থাক পাড়াগাঁয়, তবুও তো ভালোবেসে গাঁখানাকে বৃন্দাবন করে তুলেছ।"

বিশ্বপতি বদ্ধ দৃষ্টিতে নন্দার পানে তাকাইয়া রহিল,—বলিল, "ঠাউরেছ ঠিক, যমুনা যদিও সেখানে নেই, তবু আমাদের সেই কানা নদীটাও উজান বয়েছিল। বড় দুঃখ ছিল নন্দা—সেখানে তুমি ছিলে না, থাকলে একবার দেখে চক্ষু সার্থক করতে।"

নন্দা রাগ করিয়া বলিল, "আমার ভারী দায় কি না। ঘরের পানে না তাকিয়ে কোথায় কোন্ দু'টো চোখের সন্ধানে, কোথায় কার শাড়ীর আঁচল দেখে ছুটতে, আমি যেতুম তাই দেখতে? সাতপাকের বাঁধন দিয়ে যাকে আনা যায়, সে বেচারী বাধ্য হয়েই সব সয়ে যায়,—চোখের সামনে স্বামীর ব্যভিচারিতা দেখলেও একটা কথা বলবার যো তার থাকে না। আমি তো সাতপাকের বাঁধনে আসি নি বিশুদা। চোখের সামনে সে রকম দেখলে আমাদের অসহায়ের প্রধান অস্ত্র ঝাঁটা নিয়েই দৌড়াতুম।"

বিশ্বপতি নিঃশব্দে কেবল হাসিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিল।

নন্দা বলিল, "যেতে দাও ও-সব কথা। এক কথা বলতে গিয়ে হাজার কথা এসে পড়ল। বউদিকে তুমি ভালোবাস না আসল কথা সেইটেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে চাও। কিন্তু এটা যে সম্পূর্ণ ঠিক নয় এ কথা জোর করে বলতে পারি। ঠাট্টা ছেড়ে দাও, সত্যি করে বল দেখি—তুমি—"

বিশ্বপতি বাধা দিয়া বলিল, "হয় তো হতে পারে—কোন দিন তা ভাবি নি,—ভেবে দেখবার দরকারও হয় নি নন্দা।"

নন্দা পাইয়া বসিল, বলিল, "তবে পথে এসো দাদা। অনেক দিন ধরে অনেক খেলাই খেলেছ,—আজ সত্যিই ধরা দিতে হল কিনা বল দেখি? হ্যাঁ, সত্যি কথা বল—সাতখুন তোমার মাপ, বল—বউদির জন্যেই ব্যগ্রতা! আমি তোমায় যেমন করেই পারি আশ্বিন মাসের প্রথমেই বাড়ী পাঠিয়ে দেব। তা নয় কত ভণিতা,—ওঁর বাড়ী যায়, জমী যায়, সব যায়,—কাজেই ওঁকে বাড়ী যেতেই হবে, আর কোথাও থাকা চলে না। আচ্ছা, সত্যি বল বিশুদা, এই এতগুলো মিথ্যে কথা এতদিন ধরে বলার কি দরকার ছিল,—সত্যি বললে আমি কি তোমায় ধরে মারতুম—না তোমায় তাড়িয়ে দিতুম? বাপ রে, তোমরাই আবার বল মেয়েরা ভারি চাপা প্রকৃতি, সে কথা একেবারে মিথ্যে কি না বল। আমি দেখছি তোমাদের নাগাল পাওয়াই দুষ্কর,—আমাদের ক্ষমতা নেই যে তোমাদের জাতের নাগাল পাই।"

হঠাৎ কাণ উঁচু করিয়া সে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। বিশ্বপতি কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছিল, নন্দা ত্রস্তভাবে বলিল, "রোস রোস, শুনে আসি—কারা যেন বেড়াতে এসেছেন, মা আমায় ডাকছেন। আচ্ছা, তোমার কথা পরে শুনব এখন, আগে ওদিকটা দেখে আসি।" ত্বরিতপদে সে বাহির হইয়া গেল।

মায়ের আহ্বান সে শুনিতে পাইল অথচ বিশ্বপতি শুনিতে পায় নাই,—আশ্চর্য্য হইয়া সে কেবল তাকাইয়া রহিল।

বেলা বারটার ট্রেনে বিশ্বপতি গ্রামের বুকে আসিয়া দাঁড়াইল।

ট্রেন থামিতেই সে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল। সঙ্গে একটা ট্রাঙ্ক ছাড়া আর কিছুই নাই। ট্রাঙ্কে কল্যাণীর জন্য নন্দা কতকগুলি জিনিষপত্র গুছাইয়া দিয়াছে।

তাহার নিজের জন্য প্রস্তুত স্বামীর দেওয়া উপহার নূতন মিনা-করা দুল জোড়া বিশুদার স্ত্রীকে উপহার দিয়াছে, শাঁখার উপর সোণা বাঁধান দুইটী বালা এবং একটি সোণা বাঁধান লোহা দিয়াছে। এ ছাড়া কাপড়, জামা, হাতীর দাঁতে তৈয়ারী সিন্দুরের কৌটা, কোন কিছুই দিতে সে কার্পণ্য করে নাই।

তাহাকে লুকাইয়া বিশ্বপতি একখানি ধূপছায়া রঙ্গের শাড়ী, আলতার শিশি, চিরুণী প্রভৃতি কিনিয়াছে। আসার সময় নন্দাকে লুকাইয়া কোন এক সময় বাক্সে ভরিয়া লইয়াছে।

নন্দারাও আসিয়াছে, তাহারা কলিকাতায় নিজেদের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। যাইবার সময় বিশ্বপতিকে প্রণাম করিতে গিয়া তাহার পায়ের উপর মুখখানা রাখিয়া চোখের জলে পা ভিজাইয়া দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে নন্দা বলিয়াছিল, "বাড়ী গিয়েই একখানা পত্র দিয়ো বিশুদা, আর মাঝে মাঝে এক-একবার মনে করে আমার বাড়ী যেয়ো—ভুলো না। আর যদি আমায় কোন দিন এতটুকু স্নেহ করে থাক—এতটুকু ভালোবেসে থাক, তবে আমার মাথায় হাত দিয়ে বলে যাও—এবার হতে সৎ হয়েই থাকবে; আর কোন দিন নেশার জিনিষ স্পর্শও করবে না।"

বিশ্বপতি হাসিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু হাসি তাহার মুখে ফুটে নাই, সে চেষ্টার ফলে তাহার মুখখানাই কেবলমাত্র বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। সে নন্দার মাথায় হাত রাখিয়াছিল, কি বলিয়াছিল তাহা সেই জানে।

আজ ষ্টেশন ছাড়াইয়া গ্রামের পথে পা দিয়াই মনে পড়িয়া গেল পূজার আর দেরী নাই। আজ সে যেন নূতন করিয়াই আকাশের পানে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া ভাবিল আকাশ নীল হইল কবে, এ বর্ণ এতদিন লুকাইয়া ছিল কোথায় ?

মাঠের মাঝখানের পথ দিয়া চলিতে শুভ্র বন কাশ ফুলগুলি তাহার গায়ে তাহাদের কোমল স্পর্শ দিয়া জানাইল, তাহারা আজও ঠিক তেমনই আছে ;—মানুষ নিত্য বদলায়, তাহারা বদলায় না।

পাখীরা গাছের শাখায় বসিয়া,—উড়িয়া যাইতে গান গাহিয়া তাহাকেই যেন অভ্যর্থনা করিয়া গেল।

পাশেই একটা আমগাছের ঘন পাতার আড়ালে বসিয়া একটা পাখী শীষ দিতেছিল। একটু দাঁড়াইয়া বিশ্বপতি পক্ষীটাকে একবার দেখিবার চেষ্টা করিল। মনে পড়িল—এ দোয়েলেই শীষ দিতেছে ; কয়েক মাস পূর্ব্বে গ্রামে যখন সে ছিল তখন এই দোয়েলের শীষেই প্রত্যহ প্রভাতে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। ঘরের জানালার ধারে একটী গাছে বসিয়া পাখীটি প্রত্যহ ভোরের সময় গান গাহিতে সুরু করিত।

মাত্র কয়েক মাস দেশ ছাড়া ; ইহারই মধ্যে যেন কত পরিবর্ত্তন হইয়া গেছে। যেদিন সে যায় সেদিন ওই শিউলি ফুলের গাছটা লক্ষ কুঁড়ি বুকে জাগাইয়া তুলে নাই,—আজ সবুজ পাতার মাঝে লক্ষ সাদা কুঁড়ি জাগিয়াছে, গাছের তলায় কত ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে।

দ্রুতপদে বিশ্বপতি পথ অতিবাহিত করিতে লাগিল। গ্রাম্য পথ এ সময় পথিক-পরিত্যক্ত, গ্রামবাসী এ সময় নিজের নিজের গৃহে কার্য্যে ব্যাপৃত। পথে ক্বচিৎ কাহারও সহিত দেখা হইল; তাহারা পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল, একটা কথাও বলিল না।

বিশ্বপতি কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত করিল না, ছোট হালকা ট্রাঙ্কটাকে হাতে লইয়া হন হন করিয়া সে বাড়ীর দিকে চলিল।

সনাতন বাড়ীর বারাণ্ডায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল, হঠাৎ সামনে বিশ্বপতিকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি হুঁকা ফেলিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল—"এই যে দাঠাকুর,—আমি তোমার কথাই ভাবছিলুম।"

তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিয়া সে তাহার হাত হইতে ট্রাঙ্ক নামাইয়া ঘরের ভিতর লইয়া গেল, একটা মাদুর আনিয়া বারাণ্ডায় পাতিয়া দিল।

শ্রান্তভাবে বিশ্বপতি মাদুরে বসিয়া পড়িল; সনাতন বাতাস করিতে করিতে বলিল, "ওপরের জামাটা খুলে ফেল দাঠাকুর, একেবারে ঘেমে নেয়ে উঠেছ যে।"

একটু হাসিয়া গায়ের জামা খুলিতে খুলিতে বিশ্বপতি বলিল, "পাখা আমায় দাও সনাতন; তোমায় আর বাতাস করতে হবে না। তুমি একটু বস—পাঁচটা কথাবার্ত্তা হোক।"

সনাতন সে কথায় কান দিল না, আগের মতই বাতাস করিতে করিতে বলিল, "ইস, কি চেহারাই হয়ে গেছে দাঠাকুর, একেবারে যে আধখানা হয়ে গেছ, দেখে আর চিনবার যো নেই। গায়ের অমন সোণার মত রং একেবারে কালি হয়ে গেছে, সমস্ত মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে—"

বিশ্বপতি নিজের আকৃতির পানে একবার তাকাইয়া বলিল, "এখন তো বেশ ভালো হয়েছি ; যে চেহারা হয়েছিল তা যদি আগে দেখতে তা হলে জ্ঞান থাকত না।" বলিয়া সে প্রচুর হাসিতে লাগিল।

সনাতন দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া বলিল, "জগবন্ধু রক্ষা করেছেন। শ্রীরূপের মুখে সবই শুনেছি দাঠাকুর, যা অসুখ হয়েছিল ওতে যে প্রাণে বেঁচেছ এই ঢের। তুমি একটু বসো দাঠাকুর, আমি চট করে মুখুয্যে বাড়ী হতে আসি।"

সে বিশ্বপতির আহার্য্যের ব্যবস্থা করিবার জন্য উঠিয়া পড়িল। মুখুয্যে বাড়ীর মেয়েদের ধরিয়া যদি দুইটী ভাতের যোগাড় করিয়া আনিতে পারে, তাহাই সে ভাবিতেছিল। এই মানুষটা দুপুরে বাড়ী আসিয়াছে, এখন নিজেই রাঁধিয়া খাইবে, ইহা একেবারেই অসম্ভব।

সে পাখা রাখিয়া উঠিয়া অগ্রসর হইতেই বিশ্বপতি ডাকিল, "আবার মুখুয্যেদের বাড়ী কেন, হঠাৎ এমন কি দরকার পড়ল?"

মাথা চুলকাইয়া সনাতন বলিল, "তোমার খাওয়ার যোগাড় করতে।"

বিশ্বপতি দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "কেন, তারা কেউ নেই, —কোথায় গেল সব?"

কি উত্তর দিবে সনাতন তাহাই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না; সে কেবল মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল।

বিশ্বপতি প্রশ্ন করিয়া নিজেই তাহার উত্তর দিল, "বোধ হয় তার মাসীমার বাড়ী গেছে। তা যাক—একা এই বাড়ীতে থাকাও তো বড় কম কথা নয়,—ওতে আমি এতটুকু রাগ বা দুঃখ করি নি, করবও না। অনেক কাল সেখানে যায় নি, কত দিন আমি নিজে পাঠাতে চেয়েছিলুম, কিছুতেই নড়ে নি, কেবল বলেছে আমার কষ্ট হবে। যাক—

দেহটাও ভালো হবে। কিন্তু আমার খাওয়ার যোগাড় করতে ওদের বাড়ী আর বলতে যাওয়া কেন? ঘরে চাল ডাল আছে তো, ওই দু'টো খিঁচুড়ী করে নেব এখন।"

সনাতন একটা পথ পাইয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়া গেল, বলিল, "তাই কি হয় দাঠাকুর, এই সবে গাড়ী হতে নামলে—এখনই চান করে এসে নিজের খাবার নিজেই তৈরী করে নেবে—এ কখনও হতে পারে? মুখুয্যেদের বড় মাকে আমি আগেই বলে রেখেছি—তুমি এলে তোমার খাবার তাঁকে দিতে হবে। তিনি বলে দিয়েছেন বলেই না যাচ্ছি। তুমি একটু বস,—আমি এখনই ফিরে আসছি।"

সে চলিয়া গেল ও মিনিট পাঁচ সাতের মধ্যেই ফিরিয়া আসিল।

খানিক বিশ্রাম করিয়া বিশ্বপতি একবার বাড়ীর চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইল, ঘরের ভিতরটা দেখিয়া ট্রাঙ্কটাকে তক্তাপোষের উপর রাখিয়া খানিকটা তৈল মাথায় দিয়া ঘষিতে ঘষিতে সে স্নান করিতে চলিয়া গেল।

সে যখন ফিরিয়া আসিল তখন আড়াইটা বাজিয়া গিয়াছে।

সনাতন মৃদু তিরস্কার করিয়া বলিল, "একে তো ওই শরীর, এখনও ভালো করে সেরে উঠতে পারনি দা ঠাকুর, তাতে এতক্ষণ ধরে যে জল বসিয়ে এলে এটা কি উচিত হল? বড় মা কখন ভাত দিয়ে গেছেন, তোমার জন্যে বসে থেকে এইমাত্র উঠে গেলেন। নাও, এখন তাড়াতাড়ি করে কাপড় ছেড়ে খেতে বস দেখি।"

বিশ্বপতি কাপড় ছাড়িয়া আহারে বসিল। পরম পরিতৃপ্তির সহিত ভাত খাইয়া আচমন সমাপ্তে সে ঘরে আসিয়া সনাতনের প্রস্তুত বিছানায় শুইয়া পড়িল।

"আচ্ছা সনাতন, তোমার মা-লক্ষ্মী কবে মাসিমার বাড়ী গেল? ওখান হতে কেউ নিতে এসেছিল—না সে নিজেই চলে গেল?"

উত্তরের আশায় সে সনাতনের মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

কেমন করিয়া সে সংবাদ দেওয়া যায়,—সনাতন একেবারে ঘামিয়া উঠিল।

বিশ্বপতি একটা হাই তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পুরী হ'তে ফিরে এখানে এসে সে কি বললে? আমার কথা কিছু বলেছিল?"

এ সত্য আর গোপন করিয়া রাখা চলে না, এখন প্রকাশ না করিলেও ঘণ্টাখানেক পরেই প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তাহাতে এতটুকু সন্দেহ নাই।

কম্পিত কণ্ঠে সনাতন বলিল, "মা-লক্ষ্মী তো পুরী হতে ফেরেনি দা-ঠাকুর!"

"ফেরেনি—সে কি সনাতন—অ্যাঁ"—বিশ্বপতি ধড়্ফড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

সনাতন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইল।

বিশ্বপতি ডাকিল—"সনাতন—"

সনাতন মুখ তুলিল, আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "মা-লক্ষ্মী সেই গিয়েছেন, আর তাঁর ঘরে তিনি ফেরেন নি। সেই পর্য্যন্ত যক্ষের মত এ বাড়ী আগলে বসে আছি দা-ঠাকুর, এত অসুখ হয়েছে তবু এক পাও নড়তে পারি নি।"

বিশ্বপতি দুই হাতে আর্ত্ত বক্ষ চাপিয়া ধরিল, রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "মরে গেছে, কোথায় তার সব শেষ হল?"

সনাতনের মুখে শীর্ণ হাসির রেখা নিমেষের তরে জাগিয়া উঠিল,—

"মরলে ত ভালো হতো—সকল বিষয়ের শান্তি হতো। সে মরেনি দা-ঠাকুর, সে তোমার মুখে, তোমার নির্ম্মল বংশে কালি দিয়ে কোথায় চলে গেছে।"

"আর নিমাই—"

সনাতন উত্তর দিল, "সেও আর আসে নি।"

পৃথিবী কি ঘুরিতেছে, পায়ের তলা হইতে সরিয়া যাইতেছে? সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার হইয়া গেল কেন? এখানকার আলো, শব্দ, লোকজন সব কোথায় গেল?

বিশ্বপতি হাতখানা আড়াআড়ি ভাবে চোখের উপর চাপা দিয়া শুইয়া পড়িল।

সনাতন যেমন দাঁড়াইয়া ছিল তেমনই আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া অত্যন্ত করুণ নেত্রে বিশ্বপতির পানে তাকাইয়া রহিল।

বিশ্বপতি এ ধাক্কা সামলাইয়া উঠিল।

সনাতন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল—বিশ্বপতির হাসি, আনন্দ যেন বাড়িয়া উঠিল। ছেলেটা কি পাগল হইয়া গেল না কি ?

সে বিস্ময়ে বিশ্বপতির পানে তাকাইয়া থাকে। বিশ্বপতি তাহার মুখ দেখিয়া হাসিয়া বলিল, "কি ভাবছ বলব সনাতন ? ভাবছ—এ রকম একটা ধাক্কা পেয়েও আমি সইলুম কি করে ? মানুষে যা সইতে পারে না—"

সনাতন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আমি আগেই তাই খবর দেই নি দা-ঠাকুর।"

বিশ্বপতি বলিল, "ভেবেছিলে আমি অস্থির হয়ে উঠব, কিন্তু তা কেন হবে সনাতন ? সত্যি বল—ভেবে দেখ—সে বড় কম কষ্টে যায় নি, তার সে কষ্টের কথা আমি জানি,—আর কেউ জানে না। বলছো—গ্রামের লোকে যা-না-তাই বলছে,—ওরা বলুক, ওদের বলার দিন এসেছে, বলতে দাও। ওরা কি জানে সনাতন, কেবল বাইরেটা দেখে বিচার করছে বই তো নয়—ওদের কথা ছেড়ে দাও—"

বলিতে বলিতে সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

সনাতন রাগ করিয়া বলিল, "তুমি ও-রকম করে হেসো না দা-ঠাকুর। আমি আগে এ কথা বিশ্বাস করতে চাই নি, কিন্তু এখন বিশ্বাস করছি—এখন ঠিক জানছি এ রকম ব্যাপারও ঘটতে পারে। বলছ কষ্ট

পেয়ে গেছে, কিন্তু কি কষ্ট ছিল তার বল দেখি? খাওয়া-পরার কষ্ট সে তো একটা দিনও পায় নি—"

বিশ্বপতি তাহাকে থামাইয়া দিল,—"থাম সনাতন, ওই খাওয়া-পরাটাকেই খুব বড় করে দেখো না, জগতে খাওয়া-পরাটাই শ্রেষ্ঠ সুখ নয়, তা জানো? খেতে বিড়াল কুকুরেও পায়, তারাও বেঁচে থাকে; সেও তেমনি খেতে পরতে পেয়েছিল, কিন্তু এতটুকু আদর, এতটুকু যত্ন সে আমার কাছ হতে কোন দিন পায় নি। সকল মানুষের মনেই সাধ-আহ্লাদ বলে একটা জিনিস থাকে। অনেক জিনিসই মানুষ পাওয়ার কামনা করে এও তুমি জানো তো? তুমি কি বলতে চাও তোমার না-লক্ষ্মীর মনে সাধ-আহ্লাদ কিছু ছিল না, তার অন্তরের অন্তরালে কোন দিন এতটুকু কামনা-বাসনা জাগে নি? সব ছিল সনাতন, ওর ওই বুকের আড়ালে অনেক কিছুই পাওয়ার আশা জেগে ছিল, কিন্তু আমি তার একটী সাধও পূর্ণ করতে পারি নি—তার অন্তরের বিরাট দৈন্যের পানে চাই নি, ঠিক তোমারই মত তার কেবল খাওয়া-পরার আবশ্যকতাটাই বুঝেছিলুম, তাই খেতে-পরতে দিয়েই নিজের কর্ত্তব্য শেষ হয়ে গেল বলে ভেবেছিলুম। তার কোথায় বেদনা তা বুঝি নি—তার বেদনা দূর করবার চেষ্টা করি নি;—নিজের দিকে চেয়ে নিজের পাওনাগণ্ডাই বুঝে নিয়েছিলুম। তুমি বলছ কষ্ট সে পায় নি, কিন্তু আমি জানি সে তার সর্ব্বস্ব দিয়েও তার প্রতিদানে এতটুকু কিছু না পেয়েই চলে গেছে।"

উভয়েই অনেক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। নীরব ঘরে বিশ্বপতি ভাবিতেছিল—যে চলিয়া গেছে তাহার কথা, আর সনাতন ভাবিতেছিল বিশ্বপতির কথা।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সনাতন বলিল, "কিন্তু লোকের কথা আমি যে সইতে পারিনে দা-ঠাকুর।"

বিশ্বপতি শান্ত কণ্ঠে বলিল "মারামারি করবে? কিন্তু কি নিয়ে মারামারি করবে, কি কথা বলে গ্রামের লোকেদের থামাতে চাও বল দেখি? তোমার মা-লক্ষ্মী যেমন সত্যিই ঘর ছেড়ে গেছে, তেমনি সত্যিই এরা অনেক কথা বলছে। এ দুই-ই সত্যি ব্যাপার, এর মধ্যে মিথ্যের নাম-গন্ধ নেই বলেই এর প্রতিবাদ করা চলে না সনাতন। দেশের লোক বলবে আমায়ই তো—? তা বলুক, আমি সত্যি বলেই চুপ করে থাকব।"

সনাতন বলিল, "কেউ কেউ বলছে বউবাজারে নিমাইয়ের বাড়ীতে গেলেই ওদের দেখতে পাওয়া যাবে, ওরা ওখানে ছাড়া আর কোথাও নেই।"

বিশ্বপতি মাথা নাড়িল, শান্ত কণ্ঠেই বলিল, "না, কি দরকার তার, কেন আমি সেখানে তার খোঁজ করতে যাব? সে যা চেয়েছিল আমি তার কিছুই দিতে পারি নি; সে যদি এখন তা পেয়ে থাকে, আমার কি উচিত তাকে বঞ্চিত করা? কেবলমাত্র দুইটী মন্ত্র পাঠ, একটা অনুষ্ঠানের শক্তি কি এতই বেশী হবে সনাতন, যাতে একটী বিমুখ চিত্তকে ফিরান যেতে পারে? যেখানে সত্যিকার কোন আকর্ষণ নেই সেখানে সে মন্ত্রপাঠ মিথ্যে হয়ে যায়, নারায়ণ-শিলা পাথরই হয়ে থাকে, দশজন সাক্ষীর মুখর মুখও নিস্তব্ধ হয়ে যায়। আজ আমারও সব মিথ্যে হয়ে গেছে সনাতন, অন্তরের বন্ধন—অন্তরের আকর্ষণই আজ সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

মূর্খ সনাতন এ-সব কথার অর্থ বুঝিল না, কেবলমাত্র বুঝিল বিশ্বপতি স্ত্রীর উপর সকল দাবী ছাড়িয়া দিয়াছে, কুলত্যাগিনী স্ত্রীর সহিত সে আর কোনও সম্পর্ক রাখিবে না।

যে কথাটা দিনকতক সমস্ত গ্রামখানাকে বেশ সরগরম রাখিয়া আবার

নূতন প্রসঙ্গের মধ্যে চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, বিশ্বপতি ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে সে কথা আবার নূতন করিয়াই জাগিয়া উঠিল। পথে, ঘাটে, বাজারে, হাটে, সর্ব্বত্র আবার সেই চাপা কথাটা ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল। বিশ্বপতির কাণে সকল কথাই আসিতে লাগিল, সেও মনের খুসিতে অপর্য্যাপ্ত হাসিতে সুরু করিয়া দিল।

সেদিন মুখুয্যে মহাশয় তাহার দেখা পাইয়া বলিলেন, "তাই তো বাবাজি, বউ-মা যে এমন করে তোমাদের নির্ম্মল কুলে কালি দিয়ে যাবে তা আমরা কেউই স্বপ্নেও ভাবি নি। এ দিকে তো বউটি লক্ষ্মী ছিল, মুখে একটী কথা ছিল না, কেউ কখনও ওর মুখ দেখতে পায় নি; লোকে পাঁচমুখে বউয়ের সুখ্যাতি করত, সকলেই বলত—এমন বউ আর হবে না। ওর মধ্যে যে এত শয়তানী ছিল, তা আর কে জানবে বল? যাই হোক, ও-সব কথা ভেবে আর মন খারাপ করো না বাবাজি, আবার বিয়ে-থাওয়া কর, সংসার পাতাও। কিসের বয়স তোমার, তোমার বয়সে আমার দুই পক্ষ গতায়ু হয়েছিল, আমি আবার কানাইয়ের মাকে বিয়ে করবার যোগাড় করেছিলুম। কিছু ভেব না, মন খারাপ কর না; পুরুষ তুমি, সোজা চল। বাংলাদেশে মেয়ের অভাব নেই; এক স্ত্রী আছে জেনেও লোকে সেই ছেলের হাতেই নিজের মেয়ে দান করে,—আগের পক্ষের পাঁচ সাত ছেলে মেয়ে থাকতে লোকে আবার বিয়ে করে স্ত্রী আনে.—বোঝ, এ দেশের মেয়ের বাজার কি রকম, কত সস্তায় বাংলার মেয়ে বিকায়? তোমার ভাবনা কিসের বাবাজি, আজ কথা দাও, কাল দেখতে পাবে একশ মেয়ে বরণডালা সাজিয়ে তোমার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে।"

নিজের রসিকতায় নিজেই প্রীত হইয়া তিনি সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন।

বিশ্বপতি মৃদু হাসিয়া বলিল, "দেখি, দু'দিন যাক, দু'দিন পরে বিয়ে একটা করলেই হবে।"

পাড়ার কয়েকটা তরুণ একেবারে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল; তাহারা আসিয়া বিশ্বপতিকে ধরিয়া বসিল, "সে হচ্ছে না দাদা, বউদি হয় তো মুহূর্ত্তের ভুলে একটা অন্যায় কাজই করে ফেলেছেন, তাই বলে তাঁকে এত-বড় শাস্তি দেওয়া যায় না। বউদি নিমাইয়ের মত লোকের প্রলোভনে পড়ে গেছেন; আপনিও যথার্থ স্বামীর আদর্শ দেখান। আপনাকে গিয়ে তাঁকে আনতে হবে না, আমাদের হুকুম করুন, আমরা তাঁকে নিয়ে আসি।"

বিশ্বপতি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল—"না, দরকার নেই।"

সুরেশ নামে ছেলেটী বলিল, "আপনি এ দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবেন না?"

বিশ্বপতি বলিল, "না, ভুল বুঝো না, সে জন্যে আমি তাকে যে আনতে চাই নে—তা নয়। সে যেখানে সুখে আছে তাই থাক, এখানে এই কষ্টের মধ্যে আমি তাকে আনতে চাই নে।"

ছেলেরা আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তাহারা বুঝিল বিশ্বপতি যদিও কল্যাণীকে ভালোবাসিত, তবু সেই ভালোবাসার জন্যও তাহাকে ক্ষমা করিবে না।

ইহারই কয়েক দিন পরে বিশ্বপতি সেদিন সনাতনকে ডাকিয়া বলিল, "এখানে আমায় ওরা আর থাকতে দিলে না সনাতন, আমি কলকাতায় ফিরে যাই।"

উত্তেজিত হইয়া সনাতন বলিল, "লোকের কথার ভয়ে তুমি কলকাতায় পালাবে দা-ঠাকুর? কেন, তুমি কি দোষ করেছ যার জন্যে তোমায় এ দেশ ছেড়ে যেতে হবে?"

মলিন হাসিয়া বিশ্বপতি বলিল, "দোষ কারও নয়, দোষ আমার অদৃষ্টের। ওদের কথার ভয়েই যে আমি চলে যেতে চাচ্ছি তা নয়, আমার মন আর এ দেশে থাকতে চাচ্ছে না। মাসখানেকের জন্যে একবার কলকাতায় ঘুরে এলে হয় তো আবার ভালো হয়ে উঠবে।"

অপ্রসন্ন মুখে সনাতন বলিল, "সেই নন্দার বাড়ীতেই তো যাবে দা-ঠাকুর? ওকে নিয়ে দেশে বড় কম কথাটা তো হয় না; লোকে যা বলছে তা শুনলে কাণে হাত চাপা দিতে হয়। আবার ওই বাড়ীতেই থাকবে তো?"

বিশ্বপতি বলিল, "লোকে যা বলে সবই কি ঠিক হয় সনাতন? লোকের মুখ আছে, ওরা অনেক কথাই বলবে, তার মধ্যে একটা হয় তো সত্যি, দশটা মিথ্যে। আমি নন্দার বাড়ীতে ছিলাম, নন্দা প্রাণপণ যত্নে সেবা করে আমায় বাঁচিয়েছে, যারা এমন সুন্দর একটা কথা গড়বার উপাদান পেয়েছে, তারা তা ছাড়বে কেন? এতটুকু উপাদান না পেয়েও যখন মস্ত বড় প্রাসাদ শূন্যে তৈরী হতে পারে, এতে তো এতটুকু উপাদান আছে। কিন্তু ও সব কথা ছেড়ে দাও সনাতন, ও-সব ব্যাপার নিয়ে যত ভাববে ততই আরও জটিল হয়ে উঠবে।"

মূর্খ সনাতন বলিল, "কিন্তু নন্দা—"

বাধা দিয়া অসহিষ্ণুভাবে বিশ্বপতি বলিয়া উঠিল, "আবার নন্দা? নন্দা যে কি তা আমি আজও বুঝতে পারি নি সনাতন, ওকে আমি আজও চিনতে পারি নি। ওর নাগাল পেতে হলে অনেকটা উঠতে হয়, ততখানি উঠবার মত শক্তি আমার নেই,—তাই আমায় নীচেয় পড়েই থাকতে হয়েছে। সে আমায় নিজের কাছে রেখে আমার উপকারই করেছিল; যা কেউ পারে নি সে তা পেরেছিল। এ জন্যে আমায় বলতে

পার, আমি লুব্ধ পতঙ্গের মত তার দিকে ছুটেছিলুম, কোন দিকে চাই নি। অথচ স্পষ্ট যে তাকেই আশা করেছিলুম তা নয়। আমি কোন দিন বুঝতে চেষ্টা করি নি, আমারই মনের অন্তরালে তাকে পাওয়ার আশা প্রচ্ছন্ন ছিল। তবু—তবু যদি জানতে সনাতন, কতখানি এগিয়ে গেছে, তা হলে আমায় ওর কাছে থাকার জন্যে একটী কথা বলতে পারতে না।"

সে দুই হাতের মধ্যে মাথাটাকে চাপিয়া ধরিল।

সনাতন আর একটী কথা বলিল না, কিন্তু তাহার সহজ বুদ্ধিতে সে এত উঁচু ধরণের কথা যে লইতে পারিল না, তাহা তাহার অপ্রসন্ন মুখের ভাব দেখিয়া বুঝিতে পারা গেল।

বিশ্বপতি নিজের সামান্য কাপড় জামা কয়খানা গুছাইয়া নন্দার দেওয়া ট্রাঙ্কটাতেই ভরিয়া লইল। কল্যাণীর জন্য জিনিসগুলা বাক্সের তলায় চাপা দিয়া রাখিল, সে-গুলা কি করিবে সে সম্বন্ধে চিন্তা করিবার সময় সে এখনও পায় নাই।

একদিন ক্লান্ত মন লইয়া শ্রান্ত চরণে গ্রাম্যপথ অতিবাহিত করিয়া বিশ্বপতি কলিকাতায় যাত্রা করিল।

আজ গ্রামের বুকে সে সৌন্দর্য্য ছিলনা, গ্রাম আজ নেহাতই শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে—সেই জন্যই তাহার কোন আকর্ষণও নাই। বিশ্বপতির নয়নে যে মোহের অঞ্জন ছিল, চোখের জলে তাহা আজ ধুইয়া গেছে।

চলিতে চলিতে হঠাৎ একবার সে থমকিয়া দাঁড়াইল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কপালের ঘাম মুছিয়া সে একবার চারিদিকে চাহিল।

উজ্জ্বল সুনীল আলোক; বাতাসে ভাসিয়া সূর্য্যালোকে উজ্জ্বল দুই একটুকরা সাদা মেঘ আসিয়া আবার চলিয়া যাইতেছে। আকাশে

বাতাসে আজ আগমনীর সুর বাজিয়া উঠিতেছে, গাছের ডালে বসিয়া পাখীরা আগমনী গাহিতেছে। পথের ধারে স্থলপদ্ম ফুলের গাছটা অসংখ্য লাল ফুলে নিজের সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া দিতেছে। পথিক পথ চলিতে তাহার পানে তাকাইয়া মুগ্ধ হইয়া যায়। গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠের পথ। পথের দুধারে ধানের গাছগুলি বাতাসে দোলা খাইতেছে। অদূরে কাশফুলগুলির সাদা মাথা নোয়াইয়া দিয়া বাতাস দিগন্তে ছুটিয়া চলিয়াছে।

দৃষ্টি-পথ ঝাপ্সা হইয়া আসিল; সকল দৃশ্যের সামনে পাতলা কুয়াশার একখানি পর্দ্দা যেন নামিয়া আসিল।

বিশ্বপতি আর চোখ তুলিল না, পথের পানে দৃষ্টি রাখিয়া সে দ্রুত অগ্রসর হইল।

সন্ধ্যার একটু পরে বিশ্বপতি শিয়ালদহ ষ্টেশনে পৌছিল। ট্রাঙ্কটাকে হাতে লইয়া সে পথে নামিল। নন্দার বাড়ী সে চিনিত, সোজা হ্যারিসন রোড ধরিয়া সে অগ্রসর হইল। একবার একখানা রিক্সা ভাড়া লইবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু পকেটে হাত দিয়া সে ইচ্ছা দূর করিতে হইল, মাত্র কয়েকটী পয়সা ছাড়া পকেটে আর কিছু নাই।

হন হন করিয়া সে পথ চলিতেছিল; বড় রাস্তা ছাড়িয়া একটা গলিপথে খানিকদূর গিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

রূপোপজীবিনীর দল সে পথে দাঁড়াইয়া আছে, অনেক ঘরে ইহারই মধ্যে গান বাজনা সুরু হইয়া গেছে।

পাশ দিয়া চলিতে একটী মেয়ে ডাকিল,—"আসুন"।

দারুণ ঘৃণায় বিশ্বপতির মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল। সে উত্তেজিত-ভাবে কি যেন বলিতে গিয়া হঠাৎ চুপ করিয়া গেল।

মনে পড়িয়া গেল—আজ যে পথে পদার্পণ করিতে—যাহাদের পানে চাহিতে তাহার সর্ব্বশরীর ঘৃণায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে, কল্যাণীও তো এই পথে আসিয়া—উহাদেরই একজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অথবা একদিন দাঁড়াইবে। আজ হয় তো নিমাই তাহাকে খুবই যত্নে রাখিয়াছে, আজ হয় তো সে স্বপ্নেও জানে না তাহার স্থান এই পথের ধারে কোন একটা খোলার ঘরে। তাহাকেও হয় তো একদিন ইহাদেরই মত কদর্য্য সাজে নিজেকে সজ্জিত করিয়া শীর্ণ পাণ্ডুর মুখে কদর্য্য হাসির রেখা ফুটাইয়া এই পথের ধারে প্রতিদিন দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে।

কেই বা তাহা ভাবে? এই যে সব হতভাগিনীরা এখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহাদের মধ্যে কতজন যখন বাহিরের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া পথে পা দিয়াছিল তখন কল্পনাতেও আনে নাই একদিন তাহাদের সবই যাইবে—থাকিবে কেবল কাঠামোখানা। আজ তাহাদের সুখস্বপ্ন টুটিয়া গেছে, তাহাদের চোখের সামনে যে ভবিষ্যৎ, তাহা নিবিড়তম অন্ধকারে ঢাকা। উঠিতে ইচ্ছা হয় না তবু তাহাদের উঠিতে হয়। এক হাতে চোখের জল মুছিয়া তবু তাহাদের মুখে হাসি ফুটাইতে হয়। নারীজীবনে এ কি নরক বিড়ম্বনা। একদিন ইহারাই ছিল গৃহের দেবী; স্বর্গের সুষমা, স্ত্রী, কন্যা, ভগিনী; ক্ষণিকের মোহে পড়িয়া আজ তাহারা নামিয়াছে কোথায়? আজ তাহাদের অতীত জ্বালাপ্রদ, বর্ত্তমান ভীষণ ভীতিপূর্ণ, ভবিষ্যৎ নিকষ কালো অন্ধকারে ঢাকা। ইহাদের উদ্ধার করিবে কে,—সে পথই বা কই?

বিশ্বপতি ঘৃণা করিবে কাহাকে? কাহাকে সে দুই পায়ে দলিয়া পিছনে ফেলিয়া যাইতে চায়? কল্যাণীও যে উহাদের অন্তর্ভূত হইয়াছে,—একদিন পথ চলিতে বিশ্বপতি তাহার গৃহের সুষমাকেও এই পথের ধারে বিকৃত অবস্থায় লুটাইতে দেখিবে।

বিশ্বপতিকে চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সেই মেয়েটী সাহস করিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল।

পথের আলো উজ্জ্বলভাবে তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল। বিশ্বপতি তাহার মুখের পানে তাকাইয়া দৃষ্টি ফিরাইতে পারিল না।

হায় অভাগিনী নারী, তবু ওই মুখে হাসি ফুটাও, তবু ওই মুখে কথা বল? চোখের কোণ জলে ভরিয়া উঠিতেছে,—কি কষ্টেই না সে জল সামলাইয়া লইতেছ নারী,—যেন উছলাইয়া পড়িয়া তোমার গণ্ডের কৃত্রিম

বর্ণ না ধুইয়া যায়। কল্যাণী,—হায় কল্যাণী, কোথায় ছিলে, কোথায় আসিয়াছ? শেষে উদরান্নের জন্য এমনই করিয়া তোমাকেও লোকের কাছে হাত পাতিতে হইবে? হায় দুর্ভাগিনী—

খুব শান্ত সুরেই সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চাও?"

মেয়েটী নত মুখে বলিল, "আপনি যদি—"

সে যে কথাটা বলিতে চায় তাহা বলিবার আগেই বুঝিয়া লইয়া বিশ্বপতি করুণা-মিশ্রিত কণ্ঠে বলিল, "আসল কথা বল যে তোমার কিছু চাই—কেমন? কিন্তু আমার কাছে মাত্র পাঁচ আনা পয়সা ছাড়া আর কিছুই নেই। তাই নাও, এতেই আজ দিনটা কাটিয়ে দিয়ো।"

পকেট হাতড়াইয়া শেষ সম্বল পাঁচ আনা বাহির করিয়া মেয়েটীর কম্পিত হাতের উপর রাখিয়া সে দ্রুত অগ্রসর হইয়া গেল। একবার ফিরিয়াও দেখিল না, যাহাকে সে পয়সাগুলি দিয়া গেল সে তখনও সজল চোখে এই যথার্থ মানুষটার পানে তাকাইয়া রহিয়াছে। তাহার জীবনে এরূপ ধরণের মানুষ বুঝি এই প্রথম পড়িল,—সে যথাসর্ব্বস্ব,—যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, দিয়া নিঃস্বের মত চলিয়া যায়, বিনিময়ে কিছুই চায় না।

বিশ্বপতি ভাবিতেছিল পকেটে আর কিছু থাকিলে ভালো হইত। মাত্র পাঁচ আনা পয়সা; উহাতে কতক্ষণের জন্য ওই মেয়েটীর ক্ষুধা নিবৃত্ত থাকিবে? বড় জোর আজকার রাতটা,—কাল সকালেই অভাব রাক্ষসী আবার তো লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইবে! যদি বেশী কিছু থাকিত, অন্ততঃ পক্ষে দুইটা দিনও হয় তো সে স্বভাবসিদ্ধ শান্তিপূর্ণ জীবন উপভোগ করিবার সুযোগ পাইত,—দুইটা দিন সে কলঙ্ক হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিত,—নিজের ভাবনা নিজেই করিতে পাইত।

ঝোঁকের বশে পকেটে যাহা ছিল তাহাই লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, ভাবিয়া চলিয়া আসিলে আরও কিছু সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারিত।

সম্মুখে একটী নারী।

বিশ্বপতি চলার পথে বাধা পাইয়া দাঁড়াইল।

প্রথম দৃষ্টিপাতেই সে অস্বাভাবিক রকম চমকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গেল।

এ কে,—এ মুখ তাহার পরিচিত নয় কি? হাঁ—ওই মুখ চোখ, ওই সুন্দর সুঠাম ভঙ্গী, সুদীর্ঘ দেহ—এ সবই তো তাহার বড় পরিচিত।

"চন্দ্রা—"

কেমন করিয়া এই নামটা তাহার মুখ ফুটিয়া অতর্কিতে বাহির হইয়া পড়িল, তাহা নিজেই সে জানে না। নিজের কণ্ঠস্বরে সে নিজেই চমকাইয়া অবাধ্য জিহ্বাটা চাপিয়া ধরিল।

চন্দ্রা কোথায় যাইবে বলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার সামনে পথের উপর একখানা মোটর দাঁড়াইয়া বিশ্রী রকম শব্দ করিতেছিল।

নিজের নামটা শুনিবামাত্র চন্দ্রা চমকাইয়া মুখ ফিরাইল; বিশ্বপতির পানে দৃষ্টি পড়িতেই সে একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল।

পর মুহূর্ত্তে সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া একটু হাসিল. বলিল, "দাদাবাবু যে—এ পথে হঠাৎ? হাতে একটা বাক্স দেখছি, বাড়ী হতে আসছ, না বাড়ী চলেছ?"

বিশ্বপতি ভাবিতেছিল ইহার কথার উত্তর দিবে কি না। অবশেষে উত্তর দিতে হইল।

বলিল, "না—বাড়ী যাচ্ছি নে, বাড়ী হতে আসছি। তারপর—এখানেই আছ বুঝি? বেশ—বেশ, অনেক দিন পরে তোমায় দেখে

ভারি খুসি হয়েছি। কোন্ ঘরে আস্তানা তুলেছ—এই খোলার চালাখানা বোধ হয়? এ-রকম ঘর ছাড়া তোমাদের কপালে আর ঘর জুটবে কোথা হতে—আমিও তো তাই ভাবি।"

চন্দ্রা হাসিতে লাগিল, বলিল, "রোস, গাড়ীখানাকে আগে বিদায় করে দেওয়া যাক, একটু দেরী কর।"

সে অগ্রসর হইয়া গেল, বিশ্বপতি সেখানে দাঁড়াইয়া চারিদিককার বীভৎস দৃশ্যগুলা দেখিয়া লইল।

চন্দ্রা ট্যাক্সি বিদায় করিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল, বলিল, "এসো—"

বিশ্বপতি অগ্রসর হইল না, বলিল, "না, গিয়ে আর কাজ নেই, এখান হতেই বিদায় নেওয়া যাক।"

"বাঃ, বেশ লোক তুমি; তোমার জন্যে আমি গাড়ী বিদায় করে দিলাম, অত ক্ষতি সইলুম; আর তুমি কি না চলে যেতে চাচ্ছো। সে হবে না দাদাবাবু, আজ আমার ঘরে তোমার নিমন্ত্রণ, যেতেই হবে।"

সে বিশ্বপতির হাতখানা চাপিয়া ধরিতেই বিশ্বপতি জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল, "ছাড়, ছাড়, রাস্তায় আর কেলেঙ্কারী করতে হবে না, চল, যাচ্ছি।"

চন্দ্রা একটু হাসিয়া অগ্রসর হইল।

পিছনে পিছনে চলিতে চলিতে বিশ্বপতি ভাবিতেছিল যদি কোন দিন এমনই অতর্কিতে তাহার পলায়িতা স্ত্রীর সহিত দেখা হইয়া যায়!

উঃ সে কথা মনে করিতেও বুকের মধ্যে কি রকম করিয়া উঠে।—

বিশ্বপতি একবার উপরপানে চাহিয়া মাথা একটু নত করিল—সে দিন যেন না আসে, সে দিন বিশ্বপতি সহ্য করিতে পারিবে না। যত দুঃখ কষ্ট বেদনা আসে আসুক, সে দিন যেন না আসে।

দ্বিতল অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিতে করিতে বিশ্বপতি বলিল, "কারও অদৃষ্ট পাতা-চাপা, কারও পাথর-চাপা। তোমার অদৃষ্ট পাতা-চাপা ছিল কি না, তাই পাতাটা বাতাসে উড়তেই ভেতরের সুখসমৃদ্ধি প্রকাশ পেয়েছে। যাক, সত্যি ভারি খুসি হয়েছি চন্দ্রা, অদৃষ্টটা ফিরিয়েছ দেখছি। আমি তো ভেবেছিলুম কোনও একটা খোলার ঘরে জায়গা করে নিয়েছ।"

চন্দ্রা সিঁড়ির পথ দেখাইয়া উপরে উঠিতে উঠিতে বলিল, "ভদ্দর লোকের ঘরে জন্মাই নি, ছোটলোকের মেয়ে—তোমাদের আশীর্ব্বাদের জোরেই পাতা উড়ে যাবে দাদাবাবু। ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন—তাঁর আশীর্ব্বাদের জোরেই আজ অবস্থা আমার ফিরেছে।"

তীব্রকণ্ঠেই বিশ্বপতি বলিয়া উঠিল, "ভগবানের আশীর্ব্বাদ বলো না চন্দ্রা, এ নারী-জীবনের চরম অভিশাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।"

বলিতে বলিতে সে যে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল, তাহা চন্দ্রার চক্ষু এড়াইল না।

দ্বিতলে একটী সুসজ্জিত ঘরে ইজিচেয়ারে বিশ্বপতিকে বসাইয়া চন্দ্রা বলিল, "আগে একটু জল খেয়ে নাও দাদাবাবু, তার পর কথাবার্ত্তা হবে এখন। ভয় নেই, আমি হাতে করে দেব না, আমার রাঁধুনী বামনি আছে, তাকে দিয়ে দেতে বলি।"

বিশ্বপতি নিষেধ করিবার আগেই সে চলিয়া গেল। খানিক পরে একটী মেয়ের হাতে জলখাবার দিয়া সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিল।

মেয়েটী জলখাবার বিশ্বপতির সামনে তেপায়া টেবলটার উপরে রাখিয়া বাহির হইয়া গেল। অদূরে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া চন্দ্রা বলিল, "নাও জলটুকু খাও আগে, তার পর কথাবার্ত্তা হবে এখন। বুঝতে পারছি, আজ সারাদিন কিছুই খাওয়া হয় নি।—মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। জলতেষ্টা তো আছেই; তা ছাড়া ক্ষিধেও তো বড় কম হয় নি।"

বিশ্বপতি সত্যই তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "না, সত্যি ক্ষিধে হয় নি; তবে তেষ্টা যে পেয়েছে এ কথা স্বীকার না করলে মহাপাপ হবে।"

চন্দ্রা বলিল, "আচ্ছা—আগে জল খাও, তার পর কথাবার্ত্তা হবে এখন।"

বিশ্বপতি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া রেকাবীখানি অবিলম্বে খালি করিয়া ফেলিল। তাহার পর একনিঃশ্বাসে একগ্লাস জল খাইয়া সে মুখ মুছিবার জন্য কোঁচার কাপড়টা তুলিয়া লইতেই চন্দ্রা ব্যস্ত হইয়া তোয়ালে-খানা আগাইয়া দিয়া বলিল, "এইটাতে হাত মুখ মোছ।"

বিশ্বপতি একটু হাসিয়া হাত হইতে তোয়ালেখানা লইল।

চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করিল, "তার পর, যাওয়া হচ্ছে কোথায়? বাড়ী ছেড়ে চলে এলে কেন?"

বিশ্বপতি বলিল, "যাচ্ছি নন্দার কাছে, সেখানে থাকব বলে এসেছি। হঠাৎ বিশেষ নয়, অনেক ভেবে চিন্তে শেষকালে এই ব্যবস্থাই ঠিক করলুম।"

চন্দ্রা আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া বলিল, "বেশ লোক, নন্দার মোহ তোমার এখনও যায় নি দেখছি! নইলে নিজের সংসার ভাসিয়ে দিয়ে অনায়াসে চলে আসতে পারলে?"

বিশ্বপতি হাসিল, "নিজের সংসারই নেই; কার জন্যে ভাবব চন্দ্রা ?"

চন্দ্রা রাগ করিয়া বলিল, "শুনেছি মোহের আঁজন চোখে পরলে লোকে সব কিছুই দেখতে পায় না,—তাদের মনটাও সে সময় অন্ধ হয়ে যায়,—তোমারও তাই হয়েছে দাদাবাবু। নন্দা তোমায় এমনভাবে মুগ্ধ করেছে, যাতে তুমি তোমার সংসারের কথা, স্ত্রীর কথা সব ভুলে গেছ। সত্যি বল তো দাদাবাবু, বৌদিকে কোথায় রেখে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে নন্দার কাছে বাস করতে এলে ?"

বিশ্বপতি মুখ নীচু করিল। তাহার পর আস্তে আস্তে মুখ তুলিয়া ধীরকণ্ঠে বলিল, "তার ব্যবস্থা আমায় করতে হয় নি চন্দ্রা, নিজের ব্যবস্থা সে নিজেই করে নিয়েছে; তার জন্যে আমায় আর কোনো দিনই মাথা ঘামাতে হবে না। সে দয়া করে তার ভাবনা হতে আমায় চিরমুক্তি দিয়ে গেছে।"

চন্দ্রা বিস্ফারিত নেত্রে বিশ্বপতির পানে খানিক তাকাইয়া রহিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "সে কি কথা বলছ ? বউদি মারা গেছে, কই—সে কথা শুনি নি তো ?"

বলিয়াই মনে পড়িয়া গেল সে সংবাদ পাইবে কেমন করিয়া,—কে সে সংবাদ এখানে আনিয়া দিবে ? সে যেখানে বাস করে এ যে আলাদা জগৎ,—এখানে ও জগতের কোন বার্ত্তাই আসিয়া পৌছায় না।

বিকৃত হাসি হাসিয়া বিশ্বপতি বলিল, "না, সে দুর্ভাগ্য তার অদৃষ্টে আসে নি চন্দ্রা,—তা হলে অনেকখানি কামনা বাসনা নিয়ে তাকে যেতে হতো। তুমি যে পথে এসে যেখানে থেমে গেছ, সেও এই পথে গেছে, কোথায় থেমে গেছে সে সন্ধান এখনও পাই নি। তার জীবনে অনেক আশাই

ছিল কি না, দরিদ্র স্বামী তার কোন বাসনাই পূর্ণ করতে পারে নি, সেই জন্যে সে চলে গেছে।"

কতক্ষণ উভয়েই নীরব।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চন্দ্রা বলিল, "তোমার মত দরিদ্র স্বামীর ঘরে স্ত্রীরূপে বাস করবার অধিকার পেলে অনেক রাজকন্যাও ধন্য হয়ে যেত। তার অদৃষ্ট বড় খারাপ, না হলে স্বামীর স্ত্রীরূপে পবিত্র জীবন যাপন করতে সে পারলে না কেন? এই কুৎসিত চির-অভিশপ্ত জীবন যাপন করতে সে চলে গেল কেন?"

বিশ্বপতি চুপ করিয়া কোন দিকে অন্যমনস্ক ভাবে তাকাইয়া রহিল।

চন্দ্রা বলিল, "সে বুঝতে পারেনি দাদাবাবু, আপনি চলার গতিতেই সে গড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু একদিন বুঝবার দিন তার আসবে; সে দিন সে জানতে পারবে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া কতখানি ভয়ানক। নিজেকে সে দিন তাকে ধিক্কার দিতেই হবে, সে দিন তাকে চোখের জল ফেলতেই হবে। এই চিরন্তন সত্যের ব্যতিক্রম তার বেলায়ও খেটে যাবে।"

শুষ্ক হাসিয়া বিশ্বপতি বলিল, "না ঘটতেও পারে। তুমিও তো বেশ আরামে রয়েছ চন্দ্রা। এ পথে এসে সুখীই হয়েছ দেখতে পাচ্ছি; খোলার ঘর ছেড়ে দোতালা বাড়ী, লাইট, ফ্যান, দাসদাসী, কোন কিছুরই তো অপ্রতুল নেই দেখছি।"

চন্দ্রার মুখখানা মুহূর্ত্তের জন্য একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। তখনই জোর করিয়া এক টুকরা হাসি মুখে ফুটাইয়া সে বলিল, "কিন্তু দাদাবাবু, এই ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরটুকুই তুমি দেখছ,—কিসের বিনিময়ে লাভ করেছি

তা তো দেখছ না। মুখের হাসিটুকু দেখে যা ভাবছ, সত্যি তা নয়। ওই হাসির আড়ালে কান্নার সাগর গর্জ্জে ফুলে উঠছে তা দেখছ না,—দেখছ উপরেরটাই—না? আমি যদি বউদির অধিকার পেতুম, পৃথিবীর ঐশ্বর্য্য পেলেও আমি সে কুঁড়েঘর ছাড়তুম না দাদাবাবু, কিছুতেই না—কেউ আমায় একচুল সরাতে পারত না।”

হঠাৎ সে দুই হাতের মধ্যে মুখখানা লুকাইয়া ফেলিয়া উপুড় হইয়া পড়িল!

বিশ্বপতি দেখিতে লাগিল সে কি রকমভাবে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

কল্যাণীও একদিন এইরূপেই কাঁদিবে। পিছনে ফেলিয়া আসা সেই কুঁড়েঘরটার স্মৃতি হয় তো তাহার মনে ভাসিয়া উঠিবে। সে আর্ত্তভাবে কাঁদিয়া বলিবে—আমায় এ নরক হইতে উদ্ধার কর মুক্তিদাতা, আমায় তোমার চরণে স্থান দাও।

কল্পনায় ভাসিয়া উঠিল কল্যাণী। বিশ্বপতি বিস্ফারিত চোখে চাহিয়া দেখিল—রূপহীনা কল্যাণী,—তাহার পানে আর কেহ ফিরিয়াও চায় না। তাহার পাপার্জ্জিত অর্থ আর তাহাকে শান্তি দিতে পারে না,—সে সত্রাসে সেদিক হইতে চোখ ফিরাইয়া ব্যগ্র ব্যাকুল হাত দু'খানা বাড়াইয়া দিয়া আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিতেছে—এসো, ওগো এসো, আমায় মুক্ত কর আমায় এ অন্ধকার হইতে আলোয় লইয়া যাও।

হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়া গেল,—চন্দ্রা কি বলিতেছে। কাল্পনিক কল্যাণী কোথায় পলাইল,—সামনে জাগিয়া উঠিল বাস্তব চন্দ্রা।

চন্দ্রা সোজা হইয়া বসিয়াছে। তাহার চোখে জল নাই; কিন্তু চোখের পাতা তখনও আর্দ্র রহিয়াছে।

"নন্দার কাছে যাবে—তাই যাও। ওখানে থাকলে তুমি বেশ ভালো থাকবে তা জানি। তার আগে এখানে আমার কাছে দু'দিন থেকে যাও না দাদাবাবু, এতে তোমার কোন আপত্তি হবে কি?"

"এখানে, তোমার কাছে?" বিশ্বপতি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, মনে বোধ হয় দ্বিধা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

"কিন্তু এখানে থাকলে তোমার অসুবিধা হবে না চন্দ্রা? অবশ্য—আমার থাকতে কোন আপত্তি নেই। এখন যেখানে সেখানে যেমন তেমন করে জীবনের বাকি দিন কয়টা কাটিয়ে দিতে পারলেই বাঁচি। লজ্জা ভয় সঙ্কোচ কোনদিনই আমার ছিল না, তা তো জানো? তোমার বাড়ী যাওয়া নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেছিল। সে সব কথা আমার কাণে যে আসে নি তা নয়, কিন্তু সে আসাই মাত্র। থাকতে আমি পারি, ঠুনকো জাতের ওপর মায়া আমার এতটুকু নেই। সচ্চরিত্র নামে খ্যাতিলাভ করবার জন্যে আমি এতটুকু উৎসুক নই। তবে তোমার পাছে কোন ক্ষতি হয় তাই ভাবছি। কারও ক্ষতি করে আমি নিজে পরম সুখে থাকব এমন স্বার্থপর আমি নই চন্দ্রা।"

চন্দ্রা মুখ ফিরাইয়া গোপনে চোখের জল মুছিল, সঙ্গে সঙ্গে মৃদু হাসিয়া বলিল, "না গো, এতটুকু ক্ষতির ভয় যদি থাকত, আমি তোমায় এখানে রাখতে চাইতুম না। এমন বোকা তো কেউ নেই যে নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভাঙ্গবে। আজ তুমি জাতের মায়া করছ না, কিন্তু আমি করি, নিজের নয়—তোমার। আজই না হয় জাতের ছাপ আমার গায়ে নেই, একদিন তো ছিল, যেদিন আমার ছায়া মাড়ালে তোমাদের কাউকে

স্নান করতে হতো। তার ছায়াটা তো আজও এ মন হতে মোছে নি। মনে অহোরাত্র জেগে আছে বলেই কায়স্থের ছেলেকে নিজের হাতে জলটুকু পর্য্যন্ত খেতে দিতে পারলুম না। বলবে সংস্কার, আমিও তা মেনে নেব। এই সংস্কারের বাঁধন হতে মুক্ত হতে পারে কয়জন? এর প্রভাব যে-কোন রকমে মানুষের জীবনে ফুটে উঠবেই। ওই একটা দিকেই যা দুর্ব্বলতা আছে। আর ওরই জন্যে যেটুকু ক্ষতি সহ্য করেছি, তা ছাড়া আর নয়। ভয় নেই, আমার এতটুকু ক্ষতি করবার ক্ষমতা এখনও তোমার নেই। দেখছো তো কত বড় বাড়ীখানা দখল করেছি, এর মধ্যে বহু অর্থও করেছি। এত টাকা রাখব কার জন্যে, এত বড় বাড়ীখানার মালিক হবে এর পরে কে?"

বিশ্বপতি চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া একটা আড়ামোড়া ছাড়িয়া হাই তুলিয়া বলিল, "বুঝেছি, শেষ কাজটা তুমি আমায় দিয়েই করিয়ে নিতে চাও? বহুত আচ্ছা, তা হলে একটু চটপট মরে যাও চন্দ্রা, তোমার মুখে আগুন দিয়ে নেওয়া যাক। কেবলমাত্র মুখে আগুন দেওয়ার ফলে যদি এত বড় বাড়ী আর এতগুলো টাকাকড়ি পাই—সে যে অনেক সৌভাগ্যের কথা! জান ত, অনেক তপস্যা করবার ফলে তোমার মুখে আগুন দেওয়ার অধিকারী হয়েছি। অবস্থা তো বেজায় রকম কাহিল, দিন আনা দিন খাওয়া গোছের; দেশের বাড়ীখানা আছে এইমাত্র,—দেয়াল ভাঙ্গছে, চালের খড় উড়ছে, জমীজমাগুলোও বেহাত হয়ে গেছে। জীবিকার জন্যে চাকরী করা যখন পোষাবে না—যে ভাবেই হোক পরের কাছে থেকেই যখন ভাত জোটাতে হবে, তখন এখানে রাজার হালে থেকে হুকুম চালিয়ে সুখভোগ করা যাক। তবে তাই হল চন্দ্রা, দিনকতক —অর্থাৎ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্যে এখানেই ডেরা ফেললুম। দিনান্তে

তোমার সেবাটুকু নিঃশেষ করে নেওয়া যাক। শেষে কিন্তু একদিন এই আলসে প্রকৃতিটাই তোমার চোখে সূঁচ বিঁধিয়া দেবে। সে দিন বিদায় করবার পথ খুঁজে পেলে হয়।"

সে প্রচুর হাসিতে লাগিল, কিন্তু চন্দ্রার মুখখানা অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে চোখ তুলিল না, মেঝের উপর দুইটী চোখের দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়া নিস্তব্ধেই সে বসিয়া রহিল।

দিনের পর দিন কাটিয়া যাইতেছিল, বিশ্বপতি কোন সংবাদ দিল না। নন্দা প্রতিদিন সাগ্রহে অপেক্ষা করিত,—হয় তো আজ তাহার সংবাদ আসিবে, একখানি পোষ্টকার্ডে অন্ততঃ পক্ষে দু'টি মাত্র লাইনে সে লিখিয়া জানাইবে, ভালো আছে।

দিনের পর দিন চলিয়া গিয়া সপ্তাহ, তাহার পর ক্রমে মাসের পর মাসও চলিয়া গেল, বিশ্বপতি কোনও সংবাদ দিল না।

নন্দা উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল বড় কম নয়। অন্য সময় হইলে হয় তো এত ব্যস্ত হইয়া পড়িত না, কারণ, এ লোকটার স্বভাবই যে এই রকম তাহা সে বেশ জানিত। সে যখন যেখানে যায়, সকলকে আপনার করিয়া লইয়া এমন ভাবে জাঁকাইয়া বসে যে, কেহ দেখিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না—একদিন হঠাৎ এই লোকটিই এই সব পিছনে ফেলিয়া অচেনা অজানা পথে এমন যাত্রা করিবে, যখন তাহাকে ডাকিয়া আর তাহার সাড়া মিলিবে না। এই সব আপনার জন তখন তাহার একেবারেই পর হইয়া যায়,—ইহাদের কথা ভুলিয়া গিয়া আবার নূতন কোনও স্থানে দিব্য জাঁকাইয়া বসে। এ-সব প্রকৃতির লোকেরাই এমনই। ইহাদের যতই কেন না স্নেহ ভালোবাসা ঢালিয়া দেওয়া যাক, যতই শক্ত শৃঙ্খল দিয়া বাঁধা যাক, দেখা যায় সে সবই মিথ্যা হইয়া গেছে। ইহারা চিরপথিক, চিরদিন চলার পথে চলিয়াছে, বিশ্রাম ইহাদের অদৃষ্টে বিধাতা লেখেন নাই।

কোন দিন হয় তো ইহারা শান্তিও পায় না। দূরের পানে লক্ষ্য

রাখিয়া চলার কালে হাতের কাছে যাহা পড়ে তাহা হেলা করিয়াই যায়, দূর ততই দূরে সরিয়া যায়, মরীচিকা দূরে নাচিতে থাকে।

নন্দা বিশ্বপতির প্রকৃতি জানিয়াও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল কেবল তাহার অসুস্থ শরীরের কথা ভাবিয়া। অতবড় ব্যারাম হইতে যে মানুষ কেবলমাত্র সুস্থ হইয়াই একা বাড়ী চলিয়া গেল, তাহার একখানা পত্র দেওয়া উচিত ছিল বই কি।

সব বুঝিয়াও নন্দা রাগ করে। কি রকম মানুষ বিশুদা, পিছন ফিরিবার সঙ্গে সঙ্গে সে ভুলিয়া গেল একদিন কেহ প্রাণপাত করিয়া তাহার সেবা শুশ্রূষা করিয়াছে,—রোগীর পানে তাকাইয়া তাহার আহার নিদ্রা ছিল না।

মাঝে মাঝে নন্দা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িত। কোন মতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস সে রুদ্ধ করিতে পারিত না।

সে দিন কি একটা কথায় সে স্পষ্টই স্বামীকে বলিয়া বসিল, "তোমরা বড় অকৃতজ্ঞ জাত বাপু! কেউ তোমাদের জন্যে প্রাণপাত যত্ন যখন করে, তখন সে যত্ন বেশ নাও, কিন্তু পেছনে ফিরবার সঙ্গে সঙ্গে সব ভুলে যাও।"

অসমঞ্জ একটু হাসিল, বলিল, "তাই বটে। কিন্তু বিচারটা বড় একচোখো হচ্ছে নন্দা। খালি নিজেদের দিকটাই দেখছ, পুরুষদের 'পরে বড় অন্যায় দোষ চাপাচ্ছ। যদি উপযুক্ত বিচার করতে তা হলে বলতে দোষ দুই জাতেরই আছে, কেউ একা দোষী নয়।"

নন্দা খুসি হইল না, বলিল, "কেন, মেয়েরা কি দোষ করেছে?"

অসমঞ্জ মাথা দুলাইয়া বলিল, "এক হাতে কখনও তালি দিয়েছ নন্দা,—দেওয়া যায় দেখেছ? অবশ্য তুমি যেমন একমাত্র পুরুষ

বেচারাদের ঘাড়েই দোষ চাপাচ্ছ, আমি তা চাপাব না, আমি বলব না সব দোষ মেয়েদের, তারা অকৃতজ্ঞ। এ রকম একতরফা বিচার করতে তোমরা পার, আমরা পারি নে।"

নন্দা মুখ ভার করিয়া বলিল, "একতরফাই বটে। নিজেদের দোষ কে-ই বা কোন্ দিন দেখতে পায়? যদি দেখতে তা হলে অনেকটাই জ্ঞান হতো, মানুষ হতে পারতে।"

অসমঞ্জ এবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "বটে বটে, ভুলে গিয়েছিলুম তোমরা কি, আর আমরা কি? আমরা শাসক আর তোমরা যে শাসিত। নিজেদের দোষ আমরা দেখব কি করে? তোমরা চিরদিনই প্রভুর আজ্ঞাবহা দাসী, কাজেই—"

নন্দা মহা কোলাহল বাধাইয়া দিল, "ও কথা বলো না বলছি। কিসের জোরে তোমরা প্রভু আর আমরা দাসী তা প্রমাণ কর।"

অসমঞ্জ বলিল, "এ প্রমাণ করা শক্ত কি? আজই তোমায় হিন্দুদের শাস্ত্রগুলো ভালো করে দেখাব এখন, তাতেই দেখতে পাবে।"

নন্দা ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "শাস্ত্র তো তোমাদেরই পুরুষ জাতেরা তৈরী করেছে। তারা নিজেদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য দেখে ঠিক সেই মতই আইন তৈরী করেছে। আজ আমরা তোমাদের কারচুপি বেশ ধরতে পেরেছি বলেই না শাস্ত্রগুলো অতল-জলে ডুবিয়ে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে চাই।"

অসমঞ্জ বলিল, "ফেললেই তার স্মৃতি যাবে?"

নন্দা জোরের সঙ্গে বলিল, "মানুষের স্মৃতি এমন কিছু সবল নয় যে যুগ-যুগান্তর ধরে একটা ছায়া ধরে রাখবে। কাজেই সে ছায়াকে মিলাতেই হবে।"

অসমঞ্জ বলিল, "অনেক সময় ছায়াই কায়ায় পরিণত হয় নন্দা। যেদিন উপকারিতা বুঝবে সেদিন মরা ছায়াকে জীবন্ত কায়ায় পরিবর্ত্তিত করে নিতে একটুও দেরী হবে না।"

নন্দা বলিল, "উপকারিতা বুঝলে তবে তো? আমরা আজ বিচার করে দেখছি ওতে উপকার নেই, আছে অপকার। অমনি করে শাস্ত্রের দোহাই দিয়েই না এ দেশের মেয়েগুলো মরেছে। আজ যে মেয়েদের তোমরা দেখছ, সেটা ওদের কায়াই মাত্র। পদে পদে নিষেধের গণ্ডি দিয়ে রেখে তোমরাই ওদের নির্জ্জীব করে দিয়েছ। ওদের উৎসাহ—হাসি—আনন্দ নিঃশেষে শাস্ত্রের তুলি দিয়ে মুছে দিয়েছ।"

বলিতে বলিতে সে চুপ করিয়া গেল। একদিন যে মেয়েটী প্রবল ঘৃণার সঙ্গে তাহার বাণী উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহার কথা মনে করিয়া সে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল।

অসমঞ্জ চুপ করিয়া ছিল, একটু হাসিয়া বলিল, "আমি ভাবছি কি নন্দা, তুমি যদি হাজার হাজার লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই রকম লেকচার দাও, তাঁরা কি রকম তোমায়—"

রাগ করিয়া নন্দা বলিল, "যাও, সব তাইতে ঠাট্টা ভালো লাগে না।"

অসমঞ্জ বলিল, "সত্যি—ঠাট্টা নয়, সত্যিকার যা তাই বলছি। বেশ, ছেড়ে দিচ্ছি এ-সব কথা। আমার কথা আমি বলতে পারি, তাতে কোনও দোষ নেই নিশ্চয়ই। আমি একালের এই নারী-প্রগতি মোটেই যে পছন্দ করিনে তা নয়, তবে বড় বাড়াবাড়ি দেখলে অগত্যা কথা বলতে হয় বটে। হও না তোমরা খনা, লীলাবতী, গার্গী, বিশ্ববারা,—তোমরা আমাদের সত্যিকার সহধর্ম্মিণী ভগ্নি কন্যা হও, তোমাদের কাছ হতে আমরা সহায়তা পাবই। আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কেবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা

করে তোমরা শক্তি ক্ষয় কোরো না, আমাদের শক্তিও ক্ষয় কোরো না, এইমাত্র মিনতি। মনে করো দুইটী প্রধান শক্তি মিলে এক হয়ে কাজ করলে অনেক কিছুই করা যেতে পারে; কিন্তু এরা নিজেদের মধ্যে যদি মারামারি কাটাকাটি করে মরে তাতে নিজেদেরই ক্ষতি নয় কি? জগতের কোন উপকার তো হবেই না—তা ছাড়া নিজেদের অস্তিত্ব নিজেরাই লোপ করে দেবে।"

উভয়ে খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

নন্দা বলিল, "মস্ত বড় বড় কথা বলে ফেলেছ। গার্গী, বিশ্ববারার কথাটা বলা সহজ, মেনে নেওয়াই কঠিন। আজ যদি সত্যিকার বিশ্ববারা তোমাদের সামনে আসে, তোমরা তাকে যে আমল দেবে না, এ আমি ঠিক বলে দিচ্ছি। ক্ষমতার গর্ব্ব বড় বেশী। সেই গর্ব্বই তোমাদের কোন কিছু মানতে দেবে না। কে বলতে পারে, অতীতে যারা জন্মে উপযুক্ত স্থান পেয়ে নিজেদের প্রতিভা বিকাশ করতে পেরেছিল, এর মধ্যে আরও কোনও মেয়ে সেই রকম বা তার চেয়েও বেশী শক্তি নিয়ে জন্মেছিল কি না; কিন্তু তার দুর্ভাগ্য বশতঃ উপযুক্ত স্থান না পেয়ে অকালেই ঝরে পড়তে হয়েছে। এ কথা স্বীকার নিশ্চয়ই করবে এ দেশে প্রতিভার ধ্বংস হয় এই রকমে—ফুটতে গিয়ে ফুটতে না পেরে ফুল ঝরে পড়ে। তার পর শুকিয়ে রেণু রেণু হয়ে একদিন উড়ে যায়। তখন তার ফোটার দাগটুকুও থাকে না। তোমরা স্থান দাও নি, মেয়েরা তাই নিজেরাই নিজেদের স্থান গড়ে নিচ্ছে। সেখানে তারা দাঁড়াবে। অদূর ভবিষ্যতে অমন হাজার বিশ্ববারা, মৈত্রেয়ী, গার্গী এই দেশের বুকেই আবার জেগে উঠবে। আজ যাকে তোমরা বলছ উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচারিতা,—কালে এই প্রথম উচ্ছ্বাস কেটে গেলে দেখতে পাবে নির্ম্মল পরিষ্কার সুপেয়

জল—যাতে তৃষ্ণা দূর করবে—তৃপ্তি আনবে। এ কথা মানি—আজ প্রথম যে আলোড়ন এসেছে এতে তলা হতে অনেক জমা কাদা ওপরে ভেসে উঠবে। সেগুলো পরিষ্কার করবার জন্যেই না এই প্রচেষ্টা চলছে।"

একটু থামিয়া সে বলিল, "অথচ এ ময়লা জলের তলায় আছেই,—মাঝে মাঝে এক একটা চাপ যখন ভেসে ওঠে তখন সমস্ত জলটাই নোংরা হয়ে ওঠে। এ রকম ভাবে নিত্য জল নোংরা হয়ে অখাদ্য হওয়ার চেয়ে একেবারে তলার সব ময়লা ছেঁচে তুলে ফেলা ভালো। এতে জল একবারই নোংরা হবে। তার পরে যে জল পাওয়া যাবে তাতে অনেক দিন চলবে।"

অসমঞ্জ চুপ করিয়া রহিল, ভাবে মনে হইল সে নন্দার কথাগুলা ভাবিতেছে।

নন্দা কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ উঠিয়া গেল। খানিক পরে সে যখন ফিরিয়া আসিল তাহার হাতে তখন একখানা পত্র রহিয়াছে।

"দেখ, এই পত্রখানা কাল পোষ্ট করব বলে রেখেছিলুম, কিন্তু কারও হাতে দিতে আর মনে ছিল না। তুমি বার হওয়ার সময় এখানা নিয়ে যেয়ো দেখি।"

অসমঞ্জ পত্রখানা উল্টাইয়া ঠিকানাটা দেখিয়া লইয়া পকেটে রাখিল।

নন্দা বলিল, "আশ্চর্য্য দেখ—আমরা তোমাদের খাওয়া পরা, ঘুমের সময় পর্য্যন্ত দেখব শুনব, আর তোমরা পেছন ফিরলে আর ফিরে চাইবে না, একেবারে সব ভুলে যাবে—নয় কি ?"

অসমঞ্জ এবার সত্যই গম্ভীর হইয়া গেল। হাতের সিগারেটটা দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "এ কথা কিছুতেই ঠিক নয় নন্দা,—সব পুরুষই তোমার বিশুদা নয় একথা মনে কোরো।"

নন্দা বিবর্ণ হইয়া গিয়া স্বামীর পানে চাহিল।

অসমঞ্জ বলিল, "তোমার বিশুদা তোমার একটা ডাক শুনে সব ফেলে এতদূরে ছুটে এসেছিল, তখন তার বাড়ীর কথা মোটেই মনে ছিল না। তার পর একদিন যেমন বাড়ীর কথা মনে হল, সে বাড়ীর দিকে ছুটল,— তুমি যে প্রাণপাত করে তাকে বাঁচিয়েছ সে কথাটা পর্য্যন্ত সে ভুলে গেল। জেনে রাখ নন্দা, একটী মাত্র মানুষকে ধরে সমস্ত মানুষকে বিচার করা চলে না। সকল পুরুষই তোমার বিশুদা নয়, সকলেই তার মত অকৃতজ্ঞ নয়।"

নন্দার সুন্দর ঠোঁট দু'খানা কাঁপিতে লাগিল, চোখ দুইটী নিজের অজ্ঞাতেই কখন জলে ভরিয়া উঠিল।

হয় তো আত্মগোপন করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না; যদি না অসমঞ্জ উঠিয়া যাইত।

দূর নীলাকাশের একটী কোণ ঘেঁসিয়া তখন কালো একখানি মেঘ ভাসিয়া উঠিতেছিল। তাহার পানে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে নন্দার চোখের জল হঠাৎ ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

২১

একা নন্দা চুপ করিয়া ত্রিতলের খোলা ছাদে বসিয়া ছিল।

আকাশে শুক্লা পঞ্চমীর চাঁদ একটুখানির জন্য ভাসিয়া উঠিয়া হাসিতেছে।

টবের উপর ফুলগাছগুলিতে ফুল ফুটিয়াছে, তাহার মৃদু গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। দ্বিতলে খাঁচায় বদ্ধ কোকিলটা চাঁদের আলো দেখিয়া মাঝে মাঝে চীৎকার করিতেছিল—কুহু কুহু।

নন্দা ভাবিতেছিল মানুষের ব্যবহারের কথা। মানুষ জাতিটাই অকৃতজ্ঞ, ইহারা উপকারীর উপকার পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে চাহে না।

দাসী আসিয়া জানাইল বাবু ডাকিতেছেন। বিরক্ত হইয়া উঠিয়া নন্দা তাহাকে তাড়াইয়া দিল।

ইহারই খানিক পরে অসমঞ্জ স্বয়ং ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দেখা গেল সে বেশ ব্যস্ত হইয়া আসিয়াছে। আসিয়াই সে যখন নন্দার কপালে হাত দিল তখন নন্দা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও আবার কি, গায়ে হাত দিচ্ছ—কারণ ?"

অসমঞ্জ উত্তর দিল,—"দেখছি অসুখ হয়েছে কি না ?"

নন্দা তাহার হাতখানা সরাইয়া ফেলিয়া রাগ করিয়া বলিল, "থাক্ ; তুমি তো রোজই আমার জ্বর দেখছ। অমনি করে ডেকে ডেকেই না তুমি আমার জ্বর নিয়ে এসো।"

অসমঞ্জ একটু হাসিয়া বলিল, "তাই বটে ; তোমার না কি মোটেই অসুখ হয় না নন্দা, তাই তুমি এ কথা বলছ। এ রকম কথা বলা বরং

আমার মানায়, তোমায় মানায় না। তবু যদি রোজ মাথা ধরা, গা গরম না হতো,—"

নন্দা চুপ করিয়া আকাশের পানে তাকাইয়া রহিল।

অসমঞ্জ বলিল, "শুনছো নন্দা, তোমার বিশুদার খবর পেলুম।"

নন্দা ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর ?"

অসমঞ্জ একটু হাসিয়া বলিল, "বেশই আছে, কোনও অসুখ বিসুখ নেই। শুনে আশ্চর্য্য হবে নন্দা, সে আর কোথাও নেই, এখানে—এই কলকাতাতেই আছে।"

বিশ্বপতি এখানে আছে অথচ নন্দাকে একটা সংবাদ দেয় নাই, তাহার সহিত একটীবার দেখা করে নাই, এ কথা কখনও বিশ্বাস হয় ? নন্দা যখন তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া চোখের জলে ভাসিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়াছিল, "পত্র দেবে তো বিশুদা,—একটা খবর দিয়ো কেমন আছ—" তখন সে জোর করিয়াই বলিয়াছিল, "দেব বই কি,—খবর নিশ্চয়ই দেব।"

অতখানি জোর দিয়া যে কথা বলে সে মানুষটা নিজেই কি মিথ্যা, অপদার্থ ? মানুষ এমনও হইতে পারে ?

তবু নন্দা জোর করিয়া বলিল, "বিশুদা এখানে আছে—খবর দেয় নি, এ কথা কার কাছে তুমি শুনলে ? এ কখনও হতে পারে—সে একেবারে—"

অসমঞ্জ বাধা দিল,—"হয় নন্দা, জগতে অসম্ভব কিছুই নেই ; একদিন যা অসম্ভব থাকে কোনও এক সময় সেইটাই সম্ভব হয়ে যায়, এ কথা মানো তো ? তোমার কৃত উপকার হয় তো তার মনে আছে, হয় তো মনে পড়ে তাকে তুমি কি রকম সেবা যত্ন দিয়ে বাঁচিয়েছ, তবু সে আসতে

পারবে না,—আসার মত মুখ তার নেই। যে পবিত্রতা থাকলে মানুষ অবাধে সকলের সঙ্গে মিশতে পারে, সে পবিত্রতা তার নেই,—আগে হয় তো ছিল, এখন নষ্ট হয়ে গেছে। আমি কারও মুখে শুনে এ কথা বিশ্বাস করি নি, আজ নিজের চোখে তাকে দেখে আমার ভুল ভেঙ্গেছে। আজ পথে তার সঙ্গে আমার দেখা হল, সে খানিক আমার পানে চেয়ে থেকে ছুটে চলে গেল, আমি অবাক হয়ে কেবল তার পানে তাকিয়ে রইলুম।”

নন্দা খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, “বুঝেছি, বিশুদা আবার নেশা করতে সুরু করেছে। যাক, সে কোথায় আছে সে খবরটা জানতে পেরেছ?”

অসমঞ্জ অন্যমনস্ক ভাবে বলিল, “সে সন্ধান না নিয়ে আমি আসি নি নন্দা। সে যে জায়গায় আছে, সে জায়গায় ভদ্রলোকের ছেলে সজ্ঞানে যায় না।”

নন্দার মুখখানা কালো হইয়া গেল।

সেই রাত্রিটা সে মোটেই ঘুমাইতে পারিল না; ছোটবেলাকার স্মৃতিগুলা ছায়াচিত্রের মত তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল।

সেই বিশুদা,—তাহাকে কি স্নেহই না করিত, কত ভালোই না বাসিত। মনে পড়ে, একদিন পাড়ায় কোথায় কোন্ অকাজ করিয়া বিশুদা পালাইয়াছিল, দু'দিন ফিরে নাই! নন্দা তখন কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইয়াছিল। বিশুদা পালাইয়াও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে নাই, একদিন সন্ধ্যায় আসিয়া দেখা দিয়া গিয়াছিল।

এ সেই বিশুদা; এখানে—এত কাছে থাকিয়াও সে একটা সংবাদ দিল না, একবার দেখা করিল না।

মানুষের পরিবর্ত্তন অস্বাভাবিক হইয়াও এত স্বাভাবিক হইয়া যায়, কয়েক মাস পূর্ব্বে যাহাকে দেখা যায়, প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য তাহারও মাঝে লক্ষিত হয়।

কিন্তু সেই বিশুদা—যে একদিন মাতালকে ঘৃণা করিত, চরিত্রহীনকে ঘৃণা করিত, আজ তাহাকে মাতাল করিল কে, চরিত্রহীন সাজাইল কে?

নন্দার চক্ষু দুইটী কতবার অশ্রু পূর্ণ হইয়া উঠিল। দুই হাতে আর্ত্ত বক্ষটাকে চাপিয়া ধরিয়া ভাষাহীন প্রার্থনা করিতে লাগিল—"ওকে ফিরাও প্রভু, ওকে ফিরাও; একটী মানুষের অমূল্য জীবন এমন ভাবে নষ্ট হতে দিয়ো না,—ওকে পথ দেখাও, ওকে আলো দেখাও।"

মধ্যরাত্রে অসমঞ্জের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

পার্শ্বে কে যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল,—"নন্দা—"

রুদ্ধ কণ্ঠে নন্দা উত্তর দিল, "কেন?"

স্ত্রীকে পার্শ্বে টানিয়া আনিয়া অসমঞ্জ জিজ্ঞাসা করিল, "এ কি, এত রাত পর্য্যন্ত তুমি জেগে আছ, এখনও ঘুমোও নি?"

নন্দা উত্তর দিল না, স্বামীর বুকের মধ্যে মুখখানা রাখিয়া সে নীরবে চোখের জল ফেলিল।

অসমঞ্জ অন্ধকারেই তাহার মুখের উপর হইতে চুলগুলি সরাইয়া দিতে দিতে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "বুঝেছি, বিশুদার অধঃপতনের কথাই ভাবছ; তোমার মনটা বড় খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু কেন নন্দা, সে তোমার এমন কেউ নিজের লোক নয় যার অধঃপতনে তোমার মনে আঘাত লাগবে। তুমি অত ভেঙ্গে পড়লে কেন নন্দা?"

রুদ্ধ কণ্ঠে নন্দা বলিল, "তোমায় এতদিন অনেক কথাই বলেছি, একটা কথা কেবল গোপন করে গেছি, সে জন্যে আমায় মাপ কর। বিশুদা আজ

অধঃপাতের শেষ ধাপে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, সে আজ মাতাল,—চরিত্রহীন,—তোমরা তাকে ঘৃণা করবে ; কিন্তু যদি জানতে তার এই অধঃপতনের মূল কে, তা হলে তাকে ঘৃণা করতে পারতে না।”

সোৎসুকে অসমঞ্জ জিজ্ঞাসা করিল, “কে নন্দা, কে তাঁর অধঃপতনের মূল ?”

“আমি—ওগো, সে আমি—”

নন্দা দুই হাতে অসমঞ্জের একখানা হাত নিজের মুখের উপর চাপিয়া ধরিল।

আকাশ হইতে পড়িয়া অসমঞ্জ জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি ?”

উদ্ভাসিত চোখের জল কোনমতে চাপা দিয়া বিকৃত কণ্ঠে নন্দা বলিল, “হ্যাঁ, আমিই। তুমি জানো না, বিশুদা ছোটবেলা হতে আমায় খুব ভালোবাসত ; আমার সঙ্গে তার বিয়ে হয় নি, সেইজন্যে সকলের পরে—বিশেষ করে আমার পরে রাগ করেই সে অধঃপাতের পথে গেছে, নিজেকে ধ্বংস করেছে।”

অসমঞ্জ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর হঠাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নন্দা নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিল। তাহার মনে হইল, স্বামীর যে ভালোবাসা সে পাইয়াছিল, এই সময় হইতে তাহা সে হারাইয়া ফেলিল।

অসমঞ্জ পত্নীর মাথায় হাতখানা বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, “তা হলে বুঝেছ নন্দা—তোমার জন্যেই সে অধঃপাতে গেছে বলে তাকে সংশোধন করে ফিরাতে হবে তোমাকেই ? তার স্ত্রীর সে ক্ষমতা নেই, কারণ তাকে কেবল স্ত্রী নামে পরিচিতা হওয়ার গৌরবটাই দেওয়া হয়েছে, স্বামীর পরে অধিকার তার এতটুকু নেই। আমি এতে মত দিচ্ছি নন্দা ; কারণ,

আমি তোমায় বিশ্বাস করি, আমি তোমায় ভালোবাসি। আমার সেই বিশ্বাস, সেই ভালোবাসা তোমায় অটুট রেখে তাকে ফিরিয়ে আনে তোমাকে দিয়ে।”

নন্দা রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, “সত্যি তুমি আমায় বিশ্বাস কর?”

অসমঞ্জ গাঢ়স্বরে বলিল, “হ্যাঁ করি, কেন না আমি তোমায় কেবল চোখে দেখে ভালোবাসি নি, মুগ্ধ হই নি; তোমায় আমি অন্তর দিয়ে পেয়েছি, তোমার অন্তরের পরিচয় পেয়েছি। তোমায় অবিশ্বাস? না নন্দা, সে দিন, সে সময় যেন না আসে, তোমার যেন চিরদিন এমনই চোখে আমি দেখে যাই।”

নন্দার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া অসমঞ্জের হাতের উপর পড়িতে লাগিল।

অসমঞ্জ ডাকিল, “নন্দা—”

আর্দ্রকণ্ঠে নন্দা বলিল, “আমায় আশীর্ব্বাদ কর গো, যেন তোমার বিশ্বাস অটুট রেখে তোমার স্ত্রী হয়ে মাথার সিঁদূর নিয়ে মরতে পারি; মরার সময় যেন তোমায় সামনে দেখতে পাই।”

২২

মাস আট নয় বিশ্বপতির কোনও সংবাদ না পাইয়া সনাতন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

এই আত্মভোলা লোকটিকে সে যথার্থই স্নেহ করিত, ভালোবাসিত। কল্যাণী চলিয়া যাওয়ায় সনাতন বিশ্বপতির জন্যই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল, এই লোকটাকে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে তাহাই সে ভাবিয়া পায় নাই। বিশ্বপতি সে আঘাত যখন হাসিমুখে সহিয়া গেল, তখন সত্যই সে যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়া গেল। অনেক কিছু সে ভাবিয়া রাখিয়াছিল, চুপি চুপি দুই একটী মেয়ে দেখিয়া রাখিতেছিল, ভাবিয়াছিল—বিশ্বপতিকে সে আবার সংসারী করিবে। সংসারে থাকিতে গেলে এমন কত আঘাত মানুষকে সহিতে হয়; লোকে কি সে আঘাতের বেদনা ভুলিয়া গিয়া আবার নূতন করিয়া সংসার পাতে না? হয় সবই,—সন্তান মারা গেলে মা প্রথমে শোকে বাহ্যজ্ঞান হারাইলেও আবার উঠে, আবার হাসে। অমন যে নিদারুণ সন্তান-শোক, তাহাও চাপা দিতে হয়।

কিন্তু তাহার সকল ইচ্ছা নিষ্ফল করিয়া বিশ্বপতি যখন নন্দার কাছে যাইতেছে বলিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল, তখন সনাতন নন্দার উপর একেবারে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল।

হয় তো কল্যাণীকে লইয়া বিশ্বপতি সুখেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত, যদি দীর্ঘ দিন পরে নন্দা আবার নূতন করিয়া মাঝখানে আসিয়া না দাঁড়াইত। সে আকর্ষণ করিল বলিয়াই বিশ্বপতি গৃহের মায়া উপেক্ষা করিয়া দূরে চলিয়া গেল, হতভাগিনী কল্যাণী গৃহত্যাগ করিয়া কোথায়

গেল কে জানে! বিশ্বপতির গৃহ শ্মশান হইল, কল্যাণীর বড় সাধের সাজানো সংসার ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। বিশ্বপতিকে সুখী করিবার জন্য সনাতন আবার যে আয়োজন করিতেছে, নন্দা সে চেষ্টাও ব্যর্থ করিয়া দিয়া বিশ্বপতিকে কাছে ডাকিয়া লইল।

দিনের পর দিনগুলা কাটিয়া যাইতে লাগিল, বিশ্বপতি ফিরিল না, একখানা পত্রও দিল না। সনাতন নন্দার উপর আক্রোশ লইয়া ফুলিতে লাগিল।

বাকি খাজনার দায়ে যেদিন জমীদারের গোমস্তা আসিয়া যা না তাই বলিয়া অপমান করিয়া গেল, সেই দিনই ঘরের দরজায় ডবল তালা ঝুলাইয়া দিয়া সনাতন একেবারে সোজা ষ্টেশনে গিয়া উপস্থিত হইল এবং কলিকাতার টিকিট কিনিয়া ট্রেণ আসিবামাত্র সকলের আগে ট্রেণে উঠিয়া বসিল।

কলিকাতায় নন্দার বাড়ী গিয়া সে নন্দাকে বেশ দশ কথা শুনাইয়া দিবে। তাহাতেও যদি সে বিশ্বপতিকে মুক্তি না দেয়, সনাতন নন্দার স্বামিকে সব কথা বলিয়া দিবে এই তাহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

* বেচারা অসমঞ্জের জন্য তাহার কষ্ট হইতেছিল বড় কম নয়। তাহাকে সনাতন একবার মাত্র দেখিয়াছিল। আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিয়াছিল—নন্দার এমন স্বামীকেও সে ভালোবাসিতে পারে নাই,—এখনও সে বিশ্বপতিকে ভালোবাসে কি করিয়া? অসমঞ্জের মত সুপুরুষ, মহৎ হৃদয় লোক খুব কমই দেখা যায়। নন্দার অদৃষ্টক্রমেই সে এমন স্বামী পাইয়াছে। শিক্ষায় চরিত্রে, আকৃতিতে, সম্পদে অসমঞ্জ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এমন কথা বলাও তো অত্যুক্তি নয়। নন্দা এমন স্বামীর স্ত্রী হইয়া আজও তাহাকে ছলনা করে, ইহাই বড় আশ্চর্য্যের কথা।

অসমঞ্জ বেচারা কিছুই জানে না। তাহার স্ত্রী পরপুরুষের চিন্তায় আপনহারা, সে বেচারা নিজের সমস্ত ভালোবাসা সেই স্ত্রীকেই উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া যাইতেছে। স্বপ্নেও তাহার মনে কোন দিন জাগে নাই—তাহার স্ত্রীকে যাহা সে ভাবে, সে তাহা নয়। কল্যাণীকে সকলে আজ ঘৃণা করে, তাহার নাম মুখে আনিতে যে কোনও মেয়ে মুখ বিকৃতি করে, তাহার কথা কেহ শুনিতে চাহে না, কিন্তু সে যে অতৃপ্ত বাসনা লইয়া গৃহত্যাগ করিয়া গেছে, নন্দার অন্তরের অন্তরালে তাহাই নাই কি? আজ নন্দা সতী সাবিত্রীর আসনে প্রতিষ্ঠিতা থাকিয়া লোকের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতেছে কি করিয়া? সনাতন তাহার উপরের আবরণ ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়া জগৎকে দেখাইবে—আজ ভাগ্যদোষে কল্যাণী যেখানে গিয়া দাঁড়াইয়াছে, নন্দার স্থানও সেইখানে,—পূজা পাইবার যথার্থ অধিকারিণী সে নয়।

সমস্ত পথটা সে ভাবিতে ভাবিতে চলিল, যদিই সে বিশ্বপতিকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতে না পারে, তাহা হইলে অসমঞ্জকে এ সব কথা বলা উচিত কি না। এ সংবাদ শুনিলে অসমঞ্জের মনের সুখশান্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যাইবে, হয় তো আঘাত সহিতে না পারিয়া সে আত্মহত্যা করিবে, নয় তো পাগল হইয়া যাইবে। সেইটাই কি ভালো হইবে? একজনকে রক্ষা করিতে গিয়া আর একজনকে হত্যা করার মহাপাপ কি সনাতনকে অর্শিবে না?

ট্রেণ যখন শিয়ালদহে আসিয়া পৌঁছিল তখনও সে কর্তব্য ঠিক করিতে পারে নাই।

পথে চলিতে চলিতে সে একরকম কর্তব্য ঠিক করিয়া লইল। অসমঞ্জকে কোন কথা বলিয়া এখন লাভ নাই, নন্দাকে সতর্ক করিয়া দিলেই চলিবে।

নন্দার বাড়ীর সামনে যখন সে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন অসমঞ্জ কোথায় যাইবে বলিয়া বাহির হইতেছিল, মোটরখানা বাড়ীর সামনে প্রস্তুত হইয়া ছিল।

সনাতন নিকটে গিয়া দাঁড়াইল, সসম্ভ্রমে একটা নমস্কারও করিল।

বৃদ্ধ লোকটীর পানে তাকাইয়া অসমঞ্জ মনে করিতে পারিল না ইহাকে কোথায় দেখিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথা হতে আসা হচ্ছে ?"

সনাতন কুণ্ঠিত কণ্ঠে বলিল, "আমি নন্দা দিদিমণির দেশের লোক, তাঁর কাছেই এসেছি।"

অসমঞ্জ নিকটস্থ ভৃত্যকে আদেশ করিল, "একে বউদিদিমণির কাছে নিয়ে যাও, তাঁকে বলে দাও গিয়ে এ তাঁর বাপের বাড়ী হতে এসেছে।"

সে গাড়ীতে চলিয়া গেল, ভৃত্য সনাতনকে ঘরের মধ্যে বসাইয়া নন্দাকে সংবাদ দিতে গেল।

ধনীর গৃহসজ্জা দেখিয়া দরিদ্র সনাতন আশ্চর্য্য হইয়া তাকাইয়া রহিল। এত নূতন ও আশ্চর্য্য জিনিষ সে কখনও চোখে দেখে নাই। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনেই সে বলিল, "দাঠাকুরকে সহজে এখান হতে নিয়ে যাওয়া যাবে না তা বেশই বোঝা যাচ্ছে।"

নন্দা পর্দ্দার পাশে ভিতর দিকে আসিয়া দাঁড়াইল, একবার উঁকি দিয়া দেখিয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "ওমা, তুমি সোনা দা ? আমি ভাবছি দেশ হতে খবর না দিয়ে এমন অসময়ে কে এল ? এখানে বসলে কেন, ভেতরে এসো।"

সনাতন মলিন হাসিয়া উঠিল।

দ্বিতলে নিজের ঘরে নন্দা তাহাকে বসাইল।

"তার পর,—হঠাৎ যে সোনাদা, কি মনে করে? তুমি যে কলকাতায় আসবে তা যেন একেবারে স্বপ্নেরও অগোচর। দেশের সব ভালো? মুখুয্যেদের বাড়ী, শিরোমণি মশাইরা, জগৎ পিসী, তার ছেলে বউ—"

সনাতন ঈষৎ হাসিয়া জানাইল সব ভালো,—কারও কোনও অসুখ নেই।

নন্দা উৎসুক ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এবার বর্ষায় খুব জল হয়েছে—সেই সেবারকার মত? পুকুর, খানা, নদী, বিল সব জলে ডুবে গেছে,—পাড় ছাপিয়ে পথে ঘাটে জল এসেছে? আচ্ছা সোনাদা, রায়েদের বাগানে সেবারকার মত এক বুক জল দাঁড়িয়েছে,—ছেলে মেয়েরা কাগজের নৌকো গড়ে, মোচার খোলার নৌকো করে তাতে ভাসায়? শুনছি না কি এবার ধান জন্মায় নি,—সব দেশে এবার কি দুর্ভিক্ষ হবে? ওখানে ধান কি রকম হয়েছে সোনাদা?"

সনাতন বলিল, "দুর্ভিক্ষের কথা কি করে বলব দিদিমণি? আমাদের গাঁয়ে এবার তো বেশ ধানই হয়েছে; জল যেমন প্রতি বছর হয় তেমনই হয়েছে,—খুব বেশীও নয়, খুব কমও নয—পরিমাণমত।"

আরও কত কি জিজ্ঞাসা করার মত কথা আছে, কিন্তু সনাতনের শুষ্ক মুখের পানে তাকাইয়া তাহার আহারের কথা মনে করিয়া নন্দা উঠিয়া পড়িল—"ওমা, তোমার খাওয়ার কথা একেবারেই ভুলে গেছি সোনাদা, আজ সারা দিন বোধ হয় তোমার খাওয়া হয় নি। একটু বোস, আমি বামুন ঠাকরুণকে তোমার খাওয়ার কথা বলে আসি।"

সনাতন বলিল, "আমি খেয়ে এসেছি,—আমার খাওয়ার জন্যে তোমার ব্যস্ত হতে হবে না। ভোরে উঠেই ভাতে-ভাত রেঁধে খেয়েছি।"

কিন্তু নন্দা কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িল না। সনাতনকে হাত প ধুইয়া জলখাবার খাইতে হইল।

নন্দা গল্প করিতে বসিল। সে গল্প তাহার গ্রামের সম্বন্ধে! কিন্তু আশ্চর্য্য—সকলের কথাই সে জিজ্ঞাসা করিল, বিশ্বপতি বা কল্যাণীর নাম সে মুখেও আনিল না।

অনেক কথাবার্ত্তার মধ্যে সনাতন জিজ্ঞাসা করিল, "দাঠাকুর কোথায় দিদিমণি, তাঁকে দেখতে পাচ্ছি নে। ওঁর কাছে বিশেষ দরকার বলেই এসেছি, আবার সন্ধ্যার ট্রেণে আজই আমায় ফিরে যেতে হবে।"

নন্দা শুষ্ক মুখে উত্তর দিল, "বিশুদা তো এখানে নেই সোনাদা।"

সনাতন বিশ্বাস করিল না, একটু হাসিয়া বলিল, "আমাকে কেন আর মিছে কথা বলে ভুলাচ্ছ দিদিমণি? আজ আট নয় মাস হল দাঠাকুর তোমার বাড়ী আসবে বলে এসেছে। তার পর এতগুলো যে পত্র দিলুম—একখানার উত্তর পর্য্যন্ত দিলে না। মানুষটার আক্কেল দেখ একবার,—পেছন ফিরলে আর যদি একটা কথা মনে থাকে। আমি যক্ষের মত তার বাড়ী-ঘর আগলে নিয়ে বসে আছি,—একটা দিন আমার বাড়ী ফেলে নড়বার যো নেই,—যেন আমারই সব দায়। তুমিই বল দিদিমণি,—বুড়ো বয়সে লোকে কত তীর্থধর্ম্ম করে,—আমার সে তীর্থধর্ম্ম করা চুলোয় যাক, একদিনের জন্যে বাড়ী হতে বার হওয়া চলে না,—এ রকম করলে চলে কি করে? একটা মাত্র মেয়ে প্রায়ই খবর দিয়ে পাঠাচ্ছে যেন তার কাছে গিয়ে শেষ জীবনটা একটু আরামে কাটাই। সত্যি কথা বল দিদিমণি, চোখের দৃষ্টি গেছে, গায়ের শক্তি গেছে, এখন নাতি নাতনী, মেয়ে জামাই সব থাকতে কে আর খেটে খেতে চায়? ওই যে একটা কথা আছে পরের বন্ধনে বন্ধন, আমার হয়েছে ঠিক তাই।

পরের বাড়ী-ঘর জিনিসপত্র নিয়ে এমন জড়িয়ে পড়েছি, এক দণ্ড যদি হাঁফ ফেলবার অবকাশ থাকে। কেন বাপু, তোমার জিনিস বাড়ী তুমি গিয়ে দখল কর, আমি চলে যাই, আমি কেন জড়িয়ে থাকি ?"

ক্ষীণকণ্ঠে নন্দা বলিল, "সে কথা ঠিক। কিন্তু বিশুদার দস্তুরই যে তাই সোনাদা। এই দেখ না, এই কিছু দিন আগে পুরীতে সেবারে কি ব্যারামটাই না হল। অত সেবা-যত্ন করে বাঁচিয়ে তুলে দেশে পাঠালুম। মানুষ কি না একখানা পত্র পর্য্যন্ত না দিয়ে কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে রইল। ভেবে মরি। তার পর সেদিন মাত্র ওঁর মুখে বিশুদার খবর পেলুম যে সে না কি এখানেই আছে, কিন্তু সে এমন জায়গায় আছে যেখানে সহজে কেউ যেতে পারবে না।"

আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া সনাতন জিজ্ঞাসা করিল "তা হলে সত্যিই বিশুদা এখানে নেই ?"

নন্দা জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল, "আমি কি মিছে কথা বলছি সোনাদা ? এখানে থাকলে তুমি যে এতক্ষণ এসেছ নিশ্চয়ই দেখতে পেতে, সে কোথায় লুকিয়ে থাকতো ?"

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে আবার বলিল, "যার যা স্বভাব তা কি কিছুতেই যায় সোনাদা ? যে স্বেচ্ছায় পিছল পথে একবার পা দিয়েছে, সে পিছলে যাবেই, তার চলার গতি রোধ করবে কে, তাকে বাধা দিতে শক্তি কার ? বিশুদাকে ঠেকান তোমার, আমার বা বউদির কাজ নয়। ও যখন জেনে-শুনে ধ্বংসের পথে চলেছে তখন ওকে বাঁচানো আমাদের সাধ্যাতীত।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সনাতন বলিল, "বুঝেছি দিদিমণি, আর

বলতে হবে না। দাদাঠাকুরের এমনি অধঃপতন হয়, তবু আবার সে ঘরে ফিরত কেবল মা লক্ষ্মীর টানে। কিন্তু সে বাঁধন কেটে গেছে বলেই সে আর কোন দিন ঘরের পানে ফিরবে না। সে যাক্ কিন্তু আমিই বা আর কত দিন যখের মত ওই বাড়ী-ঘর আগলে বসে থাকব বল দেখি?"

বিস্মিতা নন্দা জিজ্ঞাসা করিল, "ঘরের বাঁধন কেটে গেছে মানে?"

সনাতন শুষ্ক হাসিল মাত্র।

ইহার পর সে যখন কল্যাণীর গৃহত্যাগের কাহিনী বর্ণনা করিল, তখন নন্দা একেবারে স্তম্ভিতা হইয়া গেল।

না, বিশুদাকে অধঃপাতে যাইবার জন্য দোষ দেওয়া যায় না। এরূপ আঘাত পাইলে মানুষ আত্মহত্যা করে, বেদনা ভুলিবার জন্য যে কোন দিকে চলিয়া যায়, যে কোনও প্রলেপ দিতে চায়। বিশ্বপতি পাগল হয় নাই, আত্মহত্যা করে নাই, মদ খাইয়া জ্বালা জুড়াইতে চায়।

মনে পড়িয়া গেল কল্যাণীর সেই বিবর্ণ মুখখানা। দুই হাতে দরজাটা চাপিয়া ধরিয়া সে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার নয়নে সে কি দৃষ্টি, তাহার মুখে সে কি ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল! স্বামীর পার্শ্বে নন্দাকে দেখিয়া সে কি ভাবিয়াছিল, তাহার অন্তরে কতখানি গ্লানি, কতখানি ঈর্ষা জাগিয়াছিল?

সে ভুল করিয়াছে, সে নন্দাকে চিনে নাই। নন্দার মধ্যে যে সত্যকার স্ত্রী জাগিয়া আছে তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

এই সামান্য ভুলের বশে সে যে কাজ করিয়াছে তাহা যে অসীম, অনন্ত! ইহার তো শেষ নাই; সুতরাং সংশোধনও করা যাইবে না। তাহার সারা জীবনটা কলঙ্ক-কালিমা-মণ্ডিত থাকিয়াই যাইবে,—এ কলঙ্ক হইতে মুক্তি পাইবার পথ নাই, উপায় নাই।

হায় হতভাগিনি! করিলে কি? নিজের সর্ব্বস্ব নষ্ট করিলে, স্বামীর সর্ব্বস্ব নষ্ট করিলে, নন্দারও সুখশান্তি সব ঘুচাইলে!

অনেক অনুরোধেও সনাতন নন্দার বাড়ীতে রাত্রি যাপন করিল না; বলিল, "কি করে থাকব দিদিমণি, দাঠাকুরের জিনিসপত্র সব আমার জিম্মায় রয়েছে। যদি কোন রকমে এতটুকু নষ্ট হয়ে যায় আমি যে ধর্ম্মে পতিত হব। কোন্ দিন নিজের ঘরের কথা তার মনে পড়বে, সেদিন সে ফিরে যখন দেখবে ঘর তার নষ্ট হয়ে গেছে—যেখানে যে জিনিসটী ফেলে গেছল সেখানে তা নেই, সেদিন আমায় কি বলবে, ভাবো দিদিমণি?"

এই অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকটীর মনের মহান ভাব দেখিয়া নন্দার চোখে জল আসিল।

রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল, "তুমি যাও সোনাদা। আমি শেষ একবার চেষ্টা করে দেখব যদি কোন রকমে বিশুদাকে ঘরে পাঠাতে পারি,—যদি তাকে আবার সংসারী করতে পারি। এ রকম ব্যাপার প্রায়ই তো ঘটে সোনাদা, মানুষ সামান্য ভুলে ভয়ানক সর্ব্বনাশও করে ফেলে। তা বলে সবাই তো ঘর ছেড়ে উদাস হয়ে বার হয় না, ঘরের মানুষ ঘরেই থাকে। প্রাণপণ চেষ্টা করেও বিশুদাকে আমি ঘরে ফিরাব। যত দিন সে দিন না আসে, তুমি তার ঘরখানা, তার দলিলপত্রগুলো দেখো।"

সনাতন বিদায় লইল।

মাত্র দুই দিনের জন্য যে অতিথিকে চন্দ্রা বাড়ীতে ডাকিয়া আনিয়া স্থান দিয়াছিল, সে যে চিরকালের মতই আসন পাতিয়া বসিয়া পড়িবে তাহা চন্দ্রা ভাবে নাই।

চন্দ্রা চায় না বিশ্বপতি এখানে থাকিয়া এমনই ঘৃণিত ভাবে জীবন যাপন করে। যে যাহাকে ভালোবাসে সে তাহাকে নীচু দেখিতে চায় না। সে চায়—তাহার ভালোবাসার পাত্র উপরে থাক—আরও উপরে উঠুক।

চন্দ্রা বিশ্বপতিকে বাড়ী যাইবার জন্য যতই পীড়াপীড়ি করে, বিশ্বপতি ততই তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরে।

সেদিন খুব রাগ করিয়াই চন্দ্রা বলিল, "তুমি বাড়ী যাবে কি না বল দেখি?"

বিশ্বপতি উত্তর দিল না, কেবল মাথা নাড়িল।

চন্দ্রা দৃপ্ত হইয়া বলিল, "ও-কথা বললে চলছে না। তোমার বাড়ী-ঘর সব গেল, আর তুমি এখানে দিব্যি শুয়ে বসে দিন কাটাচ্ছ। বাড়ী যাবে না, আমি কি তোমায় চিরকাল এখানে রাখব?"

বিশ্বপতি বলিল, "বাড়ী-ঘর আমার কিছুই নেই চন্দ্রা।"

ঝাঁজের সঙ্গেই চন্দ্রা বলিল, "না, তোমার কিছু নেই, তুমি একেবারে পথের ভিখারী! তোমার মতলবটা কি বল দেখি? তুমি কি চিরকালের জন্যে এখানেই থাকতে চাও?"

বিশ্বপতি হাসিল,—"থাকলামই বা, তাতে তো তোমার অসুবিধে নেই চন্দ্রা।"

চন্দ্রা এই আশ্চর্য্য-প্রকৃতি লোকটীর পানে খানিক তাকাইয়া রহিল। তাহার পর নরম সুরে বলিল, "আমার ক্ষতি অসুবিধা হোক বা না হোক, তোমার যে যথেষ্ট ক্ষতি হচ্ছে, এ কথা তো অস্বীকার করতে পারবে না। আগে মনের মধ্যে যেটুকু সৎপ্রবৃত্তি ছিল, এখন তাও গেছে। আমার বাড়ীতে দিনরাত রয়েছ, লোকে জানতে পারলে মুখে চুণকালি দেবে, সে ভয়টুকু পর্য্যন্ত নেই। তোমায় কেউ দেখে আজ ভদ্রলোকের ছেলে বলতে পারবে কি ? যেমন আকৃতি—প্রকৃতিও ঠিক তারই মত হচ্ছে যে।"

বিশ্বপতি প্রচুর হাসিতে লাগিল। তাহার হাসিতে বিরক্ত হইয়া চন্দ্রা বলিল, "নাও, হয়েছে, হাসি থামাও। সব তাইতে ওই যে হাসি, ও আমি দেখতে পারি নে। কি যে হয়েছে তোমার মনুষ্যত্ব জ্ঞান এতটুকু নেই। সেদিনে সেই ড্রাইভারটার সঙ্গে কি সব কথাবার্ত্তা বলতে সুরু করলে বল দেখি,—লজ্জায় তখন আমার মাথা যেন কাটা গেল।"

হাসি থামাইয়া বিশ্বপতি বলিল, "তখন সেটা না বুঝলেও পরে আমিও তা বুঝেছিলুম চন্দ্রা। কিন্তু জানোই তো মাতালের হিতাহিত বোধ থাকে না। একটা কথা চন্দ্রা, তুমিই বা ওর কাছে ভদ্রলোকের ছেলে বলে আমার পরিচয় দিতে গেলে কেন, বললেই হতো তোমার বাড়ীর চাকর বা বাজার সরকার ?"

চন্দ্রা মুখ ভার করিয়া রহিল।

বিশ্বপতি বলিল, "সেজন্যে যে আমার মনে এতটুকু কষ্ট হতো—তা নয়। কেন না, জানই তো, আত্মসম্মান-বোধ আমার মোটেই নেই,—ওসব বালাইয়ের ধার আমি ধারি নে। হ্যাঁ, যেদিন পথে এখানে আমায় প্রথম দেখলে, সেদিনও একটু ছিল—যার জন্যে আমি আসতে চাইনি। কিন্তু তুমি আমায় জোর করে সেদিনে ধরে নিয়ে এলে।

সেদিনে আমার মনে এতটুকু জ্ঞান ছিল—আমি ভদ্রসন্তান,—আমার সমাজ আছে, ধর্ম্ম আছে,—আমায় লোকের কাছে মুখ দেখাতে হবে। কিন্তু আজ সে জ্ঞান চাপা পড়ে গেছে চন্দ্রা,—আজ আমি পশুরও অধম হয়েছি। আজ আমার কি মনে হয় জানো? মনে হয় সমুদ্রের বুকে বিছানা পেতেছি, ঢেউ আসছে—আসুক, আমায় তো ডুবাতে পারবে না।”

চন্দ্রা অন্যমনস্ক ভাবে জানালা-পথে বাহিরের পানে তাকাইয়া ছিল, খানিক নীরবে থাকিয়া মুখ ফিরাইল। দুইটী চোখের দৃষ্টি বিশ্বপতির মুখের উপর রাখিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, “আমি যদি জানতুম তুমি পিছল পথের সন্ধানেই আছ, তা হলে তোমায় কখনই সেদিন ডেকে নিতুম না। যে ভুল করেছি, তার জন্যে নিজেই অনুতাপ করছি, কাউকেই সেজন্যে দোষ দিচ্ছিনে—দেবও না। কিন্তু একটা কথা বল দেখি, তোমার মত অনেকেই তো অধঃপাতে যায়, তারা কি আর সৎ হয় না, আর কি ঘরে ফেরে না?”

বিশ্বপতি হাসিল, বলিল, “যাবে না কেন? আমিও যেতুম, যদি আমার কেউ থাকত,—আমার ঘর জ্বালাপ্রদ না হয়ে শান্তিপ্রদ হতো। আমি কোথায় ফিরে যাব? ঘর আমার কাছে শ্মশান হয়ে গেছে,—ঘরের দিক হতে কোন ডাকই আর আমার কাণে আসে না। আজ ভাবি চন্দ্রা, যদি কেউ থাকত— ; আমার মুখের পানে তাকাতে, আমার ব্যথায় সান্ত্বনা দিতে, আমার চোখের জল মুছিয়ে দিতে যদি আমার মা কিম্বা একটা বোনও থাকত চন্দ্রা,—”

বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, আত্মগোপনের জন্যই সে তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ফিরাইল।

মুহূর্ত্ত মধ্যে সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া চন্দ্রার পানে তাকাইল, বলিল, "আমার যে কেউ নেই তা তো জানোই। সেবার পুরী গিয়েছিলুম, মাত্র তিন মাস ছিলুম—সেও কেবল ব্যারামের জন্যে। ব্যারাম যদি না হতো, অনেক আগেই বাড়ী ফিরতুম। তুমি কি মনে কর—এই তিন মাসের মধ্যে বাড়ীর কথা আমার মনে পড়ে নি, আমি বাড়ী ফিরতে চাই নি? না চন্দ্রা, তা যদি মনে করে থাকো—জেনো সে ভুল ধারণা, কেন না, আমি অহোরাত্র বাড়ীর কথাই ভাবতুম—সে কি শুধু বাড়ীর জন্যেই? সে বাড়ী তো আজও আছে, তবে আজ কেন আমি তার আকর্ষণ অনুভব করছি নে? তার কারণ, তখন যে ছিল সে আজ নেই,—তখন যে কর্ত্তব্যপালনের উৎসাহ ছিল আজ তা নেই। আমি সব হারিয়েছি, আমার সব ফুরিয়ে গেছে।"

চন্দ্রা পলকহীন নেত্রে বিশ্বপতির পানে তাকাইয়া রহিল, আস্তে আস্তে বলিল, "তবে যে একদিন বলেছিলে বউদিকে তুমি ভালোবাস না?"

বিশ্বপতি একটু হাসিল,—"কর্ত্তব্যপালনের মধ্যেও নিষ্ঠা থাকে চন্দ্রা,—নিষ্ঠাটাই অজ্ঞাতে হয় তো এতটুকু ভালোবাসা গায়ে মেখে নেয়। তাকে হয় তো ভালবাসতুম—কিন্তু অন্তরে তাকে নিতে পারি নি।"

চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করিল, "যদি জিজ্ঞাসা করি কিসে সে তোমার অনুপযুক্তা হয়েছিল,—তার তো রূপ গুণ কিছুরই অপ্রতুল ছিল না, তবু কেন তাকে অন্তরে স্থান দিতে পার নি,—সেটা কি খুব অন্যায় হবে?"

বিশ্বপতি ধীরে ধীরে মাথা দুলাইল—"অন্যায় কিছুমাত্র নয় চন্দ্রা, যে এ কথা শোনে সেই জিজ্ঞাসা করে—কেন আমি তাকে অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসতে পারি নি। আমি এ সব বিষয়ে দিলখোলা লোক, কোন দিন কিছু গোপন করি নি—করবও না।"

বলিতে বলিতে সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তখনই সে হাসি থামাইয়া বলিল, "দেখছ, কি রকম বেহায়া,—যে হাসির জন্যে এইমাত্র কত অপমান করলে, আবার—"

মর্ম্মপীড়িতা চন্দ্রা বাধা দিয়া বলিল, "কই, কখন তোমায় হাসির জন্যে অপমান করলুম ?"

বিশ্বপতি বলিল, "মেয়েদের ওই বড় দোষ,—এইমাত্র যে কথা বললে—তখনই সেটা ভুলে যায়। শোন—পণ্ডিত চাণক্য কি বলেছেন মেয়েদের সম্বন্ধে—"

চন্দ্রা রাগ করিয়া বলিল, "চাণক্যের কথা তুমিই বোঝ, আমার বুঝবার দরকার নেই, শুনতেও চাই নে।"

বিশ্বপতি বলিল, "থাক, চাণক্য বেচারাকে না হয় নিষ্কৃতি দিলুম,—উলুবনে মুক্তো ছড়িয়ে যে কোন লাভ হবে না,—শেষে খুঁজে তুলতে প্রাণান্ত হবে, তা বেশ জানি। হ্যাঁ, রাঙাবউয়ের কথা বলছিলে তো ? দেখেছিলে তো, সে কি রকম সুন্দরী ছিল ?"

চন্দ্রা কেবলমাত্র মাথাটা কাত করিল।

বিশ্বপতি বলিল, "অমন রূপ গুণ কি আমার মত লোকের কুঁড়ে ঘরে মানায় ? এ যেন বানরের গলায় মুক্তার মালা পড়েছিল,—বানরে তার কোনও মর্য্যাদা বুঝলে না—রাখলেও না। তার যা ছিল, তাতে তাকে মানাত রাজার ঘরে। আমি তাকে স্ত্রীর সম্মানটুকু পর্য্যন্ত দিতে পারি নি। কেন দিতে পারি নি সে কথা—"

সে থামিয়া গিয়া চন্দ্রার বিবর্ণ মুখখানার পানে তাকাইল।

বহুদিনকার পুরাতন একটা জনশ্রুতি চন্দ্রার মনে পড়িয়া গিয়াছিল ; নন্দা—বিশ্বপতি—কল্যাণী, আরও কত কি।

চন্দ্রা অন্যমনস্ক ভাবে তাহাই ভাবিতেছিল। হঠাৎ বিশ্বপতির কথা থামিয়া যাইতেই, সে সচকিত হইয়া মুখ তুলিতে দেখিতে পাইল, সে তাহারই মুখের উপর নীরবে দুইটী চোখের দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়াছে।

চন্দ্রা বড় অস্বস্তি বোধ করিল। একটু নড়িয়া সরিয়া বসিয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল, "তার পর—"

বিশ্বপতি জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের তার পর? তুমি বড় অন্যমনা হয়ে পড়েছ চন্দ্রা—"

চন্দ্রা জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিল, বলিল, "সত্যিই তাই, একটা কথা ভাবছিলুম।"

"বুঝেছি—আচ্ছা, একটু পরে কথা হবে এখন।" শ্রান্তভাবে বিশ্বপতি শুইয়া পড়িল।

ঘরের মধ্যে ভাত দেওয়া হইয়াছিল। বিশ্বপতিকে ডাকিতে পাঠাইয়া চন্দ্রা বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া ছিল।

জাতির ব্যবধান সে সন্তর্পণে বাঁচাইয়া চলিয়াছে। সেই জন্য কেবল মাত্র বিশ্বপতির জন্যই ব্রাহ্মণী নিযুক্ত হইয়াছে। চন্দ্রা খুব দূরে দূরে থাকে, যেন কোনক্রমে শুচিতা নষ্ট না হয়।

আত্মভোলা এই লোকটী এত দিনের মধ্যে বুঝিতে পারে নাই—চন্দ্রা সব সময় নিকটে থাকিয়া কেবল মাত্র দুই বেলা তাহার খাওয়ার সময়টিতেই সরিয়া যায় কেন।

আজ আহারের সময় ব্রাহ্মণী উপস্থিত না থাকাতেই মুস্কিল বাধিয়া গেল; চন্দ্রার কারসাজি ধরা পড়িয়া গেল।

চন্দ্রা দরজার কাছে বসিয়া ছিল। কিছুতেই ঘরের মধ্যে আসিল না দেখিয়া বিশ্বপতি একটু হাসিল মাত্র, তথনকার মত কিছুই সে বলিল না।

আহার সমাপ্তে আচমন করিতে করিতে চন্দ্রার পানে তাকাইয়া হাসি-মুখে সে বলিল, "জাতের বালাই আমি রাখতে চাইনে; অথচ তুমি জোর করে রাখাও—এর মানে?"

চন্দ্রা দৃঢ় গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "পুরুষেরা চিরদিনই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে থাকে। ওরা বাঁধন-হারার জীবন নিয়ে চিরদিনই ছুটতে চায়, মেয়েরাও যদি তাদের মত উচ্ছৃঙ্খল বাঁধনহারা জীবন ভোগ করতে চায়, তবে সবই যে যাবে, কিছুই থাকবে না। পুরুষের উদ্দাম গতি নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যেই তো মেয়েদের দরকার। গতির বেগ সবারই সমান হলে তো চলবে না।"

বিশ্বপতি বলিল, "আজকাল বেশ কথা শিখেছ তো চন্দ্রা?"

চন্দ্রা উত্তর দিল না।

বিশ্বপতি একটা পাণ মুখে দিয়া বলিল, "যাক, জাতের সম্বন্ধে আশ্বস্ত রইলুম। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে, বলব আমার জাত যায় নি। কিন্তু মন তো এ কৈফিয়তে খুসি হয় না চন্দ্রা। জিজ্ঞাসা করি—ভাতের হাঁড়ির মধ্যেই কি আমার জাতটা সীমাবদ্ধ রয়েছে?"

চন্দ্রা আশ্চর্য্য হইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মানে?"

বিশ্বপতি উত্তর দিল, "মানে খুবই সোজা, জলের মত পাতলা। এর মধ্যে শক্ত তো কিছুই নেই চন্দ্রা, যা বুঝতে দেরী হবে। ছোওয়া ভাত খেলেই আমার যে জাত চলে যায় সে জাত যাক না কেন, অমন ঠুনকো জিনিস নাই থাকল। জাত আঁকড়ে থেকে তো লাভ নেই, বরং মানুষ হয়ে বেঁচে থাকায় লাভ আছে।"

চন্দ্রা খানিক চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "জাত রাখার দরকার না বুঝে সেকালের লোকেরা তৈরী করেন নি।"

বিশ্বপতি বলিল,—"ওইখানেই যে দারুণ ভুল করে গেছেন। একটা মানুষ জাতের মধ্যে হাজার জাত তৈরী করে তাঁরা যে গণ্ডী দিয়ে গেছেন সেই গণ্ডীর জন্তেই না আজ এ রকম ভাবে আমরা ধ্বংস হচ্ছি। আমরা মুখে পরিচয় দিই আমরা বিরাট হিন্দুজাতি, কিন্তু ভাবো দেখি, এই বিরাটকে কত শত খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে? এর মধ্যে কত জলচল কত অজলচল হিসেব করলে তো স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়! এগুলো রাখার উপকারিতা কি? এতে সমাজের, দেশের, দশের কি উপকার হবে, তা আমায় বুঝিয়ে দিতে পারো?"

চন্দ্রা মাথা নাড়িল, "আমি জাতে বাগ্দী, কি করে বুঝাব?"

বিশ্বপতি মৃদু হাসিল, বলিল, "তোমার মনের ও-গলদ কিছুতেই কাটবে না দেখছি। বাপরে, কি তোমরা মেয়ে জাত, সংস্কারগুলোকে এমন করে আঁকড়ে ধরেছ—মরলেও ছাড়বে না।"

চন্দ্রা বলিল, "তাই বটে। কিন্তু এও মনে রেখো, তোমরা ভেঙ্গে যাও, আমরা কেবল গড়ে যাই। আর গড়তে গেলে সংস্কারেরই দরকার হয়। ছোট মেয়েটী ঘর গুছায়, রান্না-বান্না করে পাঁচজনকে খাওয়ায়, সেই আবার মা হয়ে সন্তান প্রতিপালন করে, অথচ শিক্ষা হয় তো সে কারও কাছে পায় নি। তবে এ বোধশক্তি তার আসে কোথা হতে? তুমি কি বলবে না এ তার সংস্কার,—তার সংস্কারই তাকে গঠন করতে, পালন করতে প্রবৃত্তি দিয়েছে?"

বিশ্বপতি বলিল, "শোন চন্দ্রা, তর্ক করতে গেলে ঢের তর্কই করা যায় যার কেবল কথায় মীমাংসা হয় না। আমি যখন তোমার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছি, তখন তুমি যা ব্যবস্থা করবে, আমায় তাই পালন করে যেতে হবে, আমি কেবল এইটাই মেনে চলব। তোমার সংস্কার তোমার থাক, আমার মত আমার থাক, কি বল?"

চন্দ্রা বিষণ্ণ মুখে একটু হাসিল।

"কিন্তু আমি একটা কথা ভাবি,—এক এক সময় তুমি বেশ জ্ঞানীর মত কথা বল, এক এক সময় অমন জ্ঞানহারা হও কেন বল দেখি?"

বিশ্বপতি মাথাটা কাত করিয়া বলিল, "ঠিক, আমিও ভাবছি কখন তুমি এই প্রশ্নটা করবে। কেন হই তা তুমি জানো তো চন্দ্রা। এ কথা আর কেউ জিজ্ঞাসা করলেও করতে পারে, তোমার জিজ্ঞাসা করা মানায় না।"

চন্দ্রা বলিল, "তবু জিজ্ঞাসা করছি—তোমার মুখ হতে স্পষ্ট কথা শুনতে চাই। শুনেছিলুম নন্দার জন্যেই তুমি নিজেকে পতিত করেছ—"

বিশ্বপতি বাধা দিল, "হ্যাঁ,—আমার পতিত হওয়ার কারণ সেই মেয়েটাই বটে। কিন্তু এর জন্যে তাকে তুমি অভিশাপ দিতে পার না চন্দ্রা। আমাকেই দোষ দাও। দোষী সে নয়—আমি। আজ এই প্রথম তোমার কাছে বলছি চন্দ্রা—জানি তোমার মনে ব্যথা লাগবে,—জানি তুমি আমায় কতখানি স্নেহ কর, কতখানি ভালোবাসো, সেই ভালবাসার জন্যেই কতখানি ত্যাগ করেছ। আমায় হয় তো ঘৃণা করবে চন্দ্রা, কারণ, আমিও তোমায় এ পর্য্যন্ত জানিয়ে এসেছি—আমি তোমায় ঠিক অতখানিই স্নেহ করি—ভালোবাসি। এই ছলনার মধ্যে এতটুকু ফাঁক কোন দিন দেখতে পেয়েছ চন্দ্রা? না, তা পাও নি। পাছে আলগা হয়ে আসে তাই আমি বাঁধনের পর বাঁধন চাপিয়ে গেছি, বোঝার পর বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি; আলগা হতে এতটুকু সুযোগ দিই নি। আজ নন্দা পরের স্ত্রী, আমি পরের স্বামী। আমাদের মাঝখানে অনন্ত অসীম ব্যবধান জেগে রয়েছে। মরণের ওপারে গিয়েও যে কেউ কাউকে পাব সে আশা আমি করি নে, সে বিশ্বাসও আমার নেই; কেন না পরজন্ম—পরলোক তোমরা মানতে পার, আমি মানি নে। আমি জানি মাটির কোলে জন্মেছি, এখান হতে লব্ধ আশা আকাঙ্ক্ষার লয় এখানেই হয়ে যাবে। উর্দ্ধে বা অধেঃ কোন দিকেই আমার পথ নেই। আমার মাটি-মা নিজেই আমায় তার বুকে টেনে ঘুম পাড়াবে,—বস্, এইটুকুই শেষ।"

চন্দ্রা একটা নিঃশ্বাস ফেলিল—অতি গোপনে—যেন বিশ্বপতির কাণে না যায়। বলিল, "কিন্তু নন্দাকে ভালোবেসে তোমার শাস্তি হল কি, তুমি পেলে কি?"

বিশ্বপতি শুধু হাসিল, "শুধু জ্বালা, বেদনা ছাড়া আর কিছুই পেলুম

না। একদিন, জানো চন্দ্রা—প্রথম যখন আমি নন্দাকে ভালোবেসেছিলুম, সেদিন নীল আকাশকে সাক্ষী করে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম তাকে ছাড়া আর কাউকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করব না, আর কোনও নারীকে ভালোবাসব না, আর কোনও নারীর দেহ স্পর্শ করব না—"

আর্দ্রকণ্ঠে চন্দ্রা বলিল, "কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা তো অটুট রইল না।"

বিশ্বপতির মুখের উপর ক্লান্তির ছায়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। শ্রান্ত-কণ্ঠে সে বলিল, "না, রইল, না; কেন রইল না বলি। যেদিন শুনলুম নন্দার বিয়ে হয়ে গেল, যেদিন দেখলুম তার মুখে হাসি ফুটে উঠেছে, যেদিন শুনলুম নিজের মুখে সে বললে অসমঞ্জের সঙ্গে বিয়ে হওয়ায় সে সুখী হয়েছে, সেইদিন আমার চোখের উপর হতে একটা কালো পর্দা খসে পড়ে গেল, আমি এক নিমেষে সমস্ত জগৎটাকে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলুম। সেইদিন হতে আমার জীবনের ওপরে দারুণ বিতৃষ্ণা এলো,—আমি ইচ্ছা করেই নিজেকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে চললুম। মা একবার বলতেই আমি কল্যাণীকে বিয়ে করলুম। তার পর তোমাকে ধ্বংস করলুম—মনে পড়ে চন্দ্রা? তুমি কোথায় ছিলে, তোমাকে টেনে নিয়ে এসেছি কোথায়। বাগ্দীর ঘরে জন্ম নিলেও হিন্দুর আদর্শ সীতা সাবিত্রীর সম্পদই তো তোমার ছিল! সে সম্পদ চুরি করলে কে, আমিই নই কি?"

চন্দ্রার চোখে জল আসিয়াছিল, সে অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া চোখ মুছিতে লাগিল।

কাহাকে সে ভালোবাসে, কাহার জন্য সেও সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে? সে কি এই বিশ্বপতিই নহে? গ্রামে থাকিতে অপর্য্যাপ্ত কলঙ্ক দুই হাতে কুড়াইয়াছে। কেবল মাত্র বিশ্বপতিকে রক্ষা করিবার জন্যই সে সহরে

পালাইয়া আসিয়াছিল। এখানে অতখানি প্রতিষ্ঠা, অর্থ, সম্পদ লাভ করিয়াও সে সব বিসর্জ্জন দিয়াছে—সে কি এই লোকটার জন্যই নহে? অভাগিনী কল্যাণী আজ গৃহত্যাগিনী, কলঙ্কের পসরা মাথায় লইয়া দীনা হীনা কাঙালিনীর মত কোথায় কোন্ পঙ্কের মাঝে নিজের স্থান খুঁজিয়া লইয়াছে—সেও কি ইহার জন্য নয়? কেবলমাত্র কর্ত্তব্যনিষ্ঠাটুকু সম্বল করিয়া কয়টী নারী বাঁচিয়া থাকিতে পারে? তবু তাহার উপর কেবল-মাত্র কর্ত্তব্যের খাতিরে বিশ্বপতির যে আকর্ষণটুকু ছিল, চন্দ্রার উপর তাহাও নাই। তবু চন্দ্রা তাহাকে তেমনি গভীর ভাবে ভালোবাসে, যেমন সর্ব্বপ্রথমে ভালোবাসিয়াছিল।

চন্দ্রা চোখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল, "নন্দা আজও তোমায় ভালবাসে?"

বিশ্বপতি উত্তর দিল, "বাসে—কিন্তু সে ভালোবাসা অন্য ধরণের। বোন যেমন তার ভাইকে ভালোবাসে, মা যেমন তার সন্তানকে ভালোবাসে, নন্দা আমায় সেই রকম ভালোবাসে। আজ ভাবি চন্দ্রা,—হ্যা, দিনরাত নেশায় ভোর হয়ে থাকি বলে যে ভাবি নে তা নয়,—আমি ভাবি—যদি সেদিন তোমার এখানে না এসে আমি বরাবর নন্দার কাছে যেতুম, আমি মানুষ হয়েই বাঁচতুম, এ রকম জানোয়ার হতুম না। তুমি আজ যত সংযত ভাবেই থাক, যত সংই হও, তবু তুমি তুমিই, নন্দার পায়ের ছায়া স্পর্শ করিবার অধিকার তোমার নেই,—তুমি চিরদিন সকলের সামনে ঘৃণিতা হয়েই থাকবে। তুমি নিজেই পাঁকের মধ্যে পড়ে আছ, আমায় তুমি তুলে ধরবে সে শক্তি তোমার কই? তার সে শক্তি আছে। সে আমায় ভদ্রভাবে ভদ্রসমাজে নিয়ে যেতে পারত, আমার জীবন আলোয় উজ্জ্বল করে দিত, অন্ধকারের মধ্যে এমন করে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আমায় মরতে হতো না।"

হাত দু'খানা আড়াআড়ি ভাবে চোখের উপর চাপা দিয়া বিশ্বপতি নিস্তব্ধে পড়িয়া রহিল।

চন্দ্রা হঠাৎ প্রশ্ন করিয়া বসিল, "যাবে?"

বিশ্বপতি হঠাৎ চমকাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায়?"

চন্দ্রা বলিল, "নন্দার কাছে? আমি তোমায় এখনি সেখানে পাঠিয়ে দেব।"

বিশ্বপতি হাসিল, ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, "মুখ দেখানোর মুখ নেই চন্দ্রা। পথ হয় তো আছে, কিন্তু সে পথে কাঁটা ফেলা। ওর কাছে যাওয়ার পথ আমার চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে। যে মুখ একদিন ওকে দেখিয়েছি, সে মুখে নিজের হাতে কালি মেখেছি।"

চন্দ্রা বিকৃত কণ্ঠে বলিল, "পথের কাঁটা তুলতে পারা যায়, মুখের কালিও মুছে ফেলা যায়।"

গম্ভীর মুখে বিশ্বপতি বলিল, "হ্যাঁ, তা হয় তো যায়; মনের কালি ওঠে না চন্দ্রা, সেখানকার কাঁটাও ওঠে না। আমার মনের স্মৃতির পাতাগুলি যে কালিতে ভরে গেছে, সে কালি আমি মুছতে পারব কি? তুমি কি মনে ভাবছ, আমার অধঃপতনের এই কাহিনী তার কাণে পৌঁছায় নি? একদিন মাতাল অবস্থায় তার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে নির্ব্বাকে আমার পানে তাকিয়ে ছিল। সে কি তার স্ত্রীকে গিয়ে এ কথা বলে নি?"

চন্দ্রা নতমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বিশ্বপতি উদাসভাবে বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চন্দ্রার কোনও সাড়া না পাইয়া সে মুখ ফিরাইল—"চন্দ্রা, কাঁদছ?"

চন্দ্রা তেমনই মাথা নত করিয়া রহিল। নিঃশব্দে চোখের জল তাহার আরক্তিম গণ্ড দুইটী ভাসাইয়া দিতে লাগিল।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিশ্বপতি বলিল, "ওই দেখ, ওই তো তোমাদের দোষ। কথা শুনতে চাইবে অথচ তা সইবার ক্ষমতা নেই। ওই জন্যেই আমি এত কাল কোন কথা বলি নি, আজও বলতে চাচ্ছিলুম না, নেহাৎ জানতে চাইলে বলেই সব কথা বলে ফেল্‌লুম।"

কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া চন্দ্রা বলিল, "না, সে জন্যে আমি এতটুকু কষ্ট পাই নি। আমি ভাবছি, তোমার ইহ-পরকাল যে সব গেল, এর জন্যে দায়ী কে,—আমিই নই কি?"

বিশ্বপতি শুষ্ক হাসিয়া বলিল, "দায়ী কেউ নয়, দোষী কেউ নয়; দোষী আমি—দায়ী আমি। কিন্তু চন্দ্রা—আমায় এখান হতে যেন বিদায় করে দিয়ো না। যখন আশ্রয় দিয়েছ তখন থাকতে দিয়ো। তুমি যা খুসি তাই কর—আমি তাতে আপত্তি করব না, তাকিয়েও দেখব না। আমায় কোণের দিকে একটা ঘর দিয়ো, দিনে কিছু করে মদ দিয়ো, দু'বেলা দু'টো দু'টো করে ভাত আর ক'খানা কাপড় দিয়ো—বস্, আমার দিন বেশ কেটে যাবে।"

চন্দ্রা মুখ ফিরাইয়া চোখের জল মুছিতেছিল। ঠোঁটের উপর একটু হাসির রেখা ফুটাইয়া তুলিয়া বলিল, "দেখা যাবে। আসল কথা বল, আমায় তোমার অসহ্য বোধ হয়েছে; সেই জন্যেই তফাতে থাকবার ব্যবস্থা করার কথা বলছ। বেশ, আমি আজ হতে তোমার আলাদা ব্যবস্থা করে দেব এখন।"

ধীরে ধীরে সে উঠিয়া পড়িল। বিশ্বপতি বিস্মিত নয়নে এই অদ্ভুত

মেয়েটীর পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার পানে না তাকাইয়া চন্দ্রা বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

সুনীল আকাশের এক কোণে একখানা মেঘ জমিয়া উঠিয়াছে। এদিক হইতে বাতাসে ভাসিয়া দুইখানি মেঘ তাহার পানে ছুটিয়াছে। তাহারা পরস্পর মিলিতে গিয়া মিলিতে পারিল না ; একটী বড় মেঘখানির সহিত মিলিয়া গেল, অপরখানি পাশ কাটাইয়া অনির্দ্দিষ্টের পানে ছুটিয়া চলিল।

কত দিন এমন কত দৃশ্য চন্দ্রার নয়ন-সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছে,—সে দেখিয়াও দেখে নাই, আজ সে দেখিল।

ওই বৃহতের পানে লক্ষ্য রাখিয়া সকলেই ছুটিয়াছে। কত লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র আসিয়া বৃহতের সহিত মিশিয়া তাহাকে বৃহত্তর করিয়া তুলিতেছে। দূর হইতে ক্ষুদ্রতম কত খণ্ড যে ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া মিলিতে পায় না, অসীম আকাশে দিশা হারাইয়া লক্ষ লক্ষ যুগ তাহাদের ফিরিতে হয় সে সন্ধান কে রাখে, কে তাহাদের পানে তাকায় ?

চন্দ্রা আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, রেলিংয়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া সে ঝর ঝর করিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

তাড়াতাড়ি ট্রাম হইতে নামিতে গিয়া কি করিয়া পা বাধিয়া পড়িয়া গিয়া মাথায় দারুণ আঘাত পাইয়া বিশ্বপতি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে তাহার চেতনা ফিরিয়া আসিল। নিজের চারি দিকে এত লোকজন দেখিয়া সে খানিক বিস্মিতভাবে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল।

যাহারা তাহার সেবার ভার লইয়াছিল তাহারা ছাড়া যাহারা কেবল-মাত্র ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল—চলিয়া গেল।

বিশ্বপতি উঠিবার উদ্যোগ করিতে একটী ছেলে বলিল, "আর খানিকটা শুয়ে থাকুন মশাই, ডাক্তার বলেছেন আর কুড়ি পঁচিশ মিনিট আপনাকে শুয়ে থাকতে হবে।"

বিশ্বপতি একটু হাসিয়া বলিল, "যে ডাক্তার এ রকম ভাবে শুয়ে বিশ্রাম নেওয়ার ব্যবস্থা করেন তিনি আমাদের মত গরীব লোকদের জন্যে তৈরী হন নি মশাই। এ-সব গরীবের ব্যবস্থা অত ঘড়ি ধরে করতে গেলে চলে না। পড়ে গেলেও আমাদের তখনি উঠতে হয়, খাটতে হয়, আবার—"

বলিতে বলিতে মুখ তুলিয়া সে ছেলে কয়টীর পানে তাকাইয়া হঠাৎ নীরব হইয়া গেল।

যে ছেলেটীর হাতে পাখা ছিল সে জিজ্ঞাসা করিল, "আবার কি মশাই?"

বিশ্বপতি উত্তর দিল না। পিছনে যে ছেলেটী আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া ছিল তাহারই পানে তাকাইয়া সে যেন আঘাতের দারুণ বেদনাও ভুলিয়া গেল।

"নিমাই—"

নিজের রূঢ় কণ্ঠস্বরে নিজেই সে চমকাইয়া উঠিয়া নীরব হইয়া গেল।

নিমাই অগ্রসর হইয়া আসিল। তাহার বিবর্ণ মুখে একটু হাসি। তাহা যেমন ক্ষীণ, তেমনই মলিন—যেন জোর করিয়া টানিয়া আনা।

বিস্মিত ছেলে কয়টীর পানে তাকাইয়া নিমাই বুঝাইয়া দিল— "আমাদের গাঁয়ের লোক, আমাদের বিশুদা, বুঝলি রে সমীর।"

সমীর ছেলেটী যেন হাঁফ ফেলিয়া বাঁচিল, বলিল, "ওঃ, সেই জন্মেই বুঝি তুমি অমন করে ছুটে এলে, বুক দিয়ে পড়ে সেবা করলে নিমাইদা? তাই বল—তোমার দেশের লোক কি না—সেই জন্মেই—"

নিমাই বাধা দিল, "থাম থাম, পাগলামো করিস নে। আমার বিশুদা বলে আমি না হয় সেবা করলুম, তোরা করলি কেন বল তো? একা আমার গুণই গাস নে ভাই, তোদের না পেলে বিশুদাকে ওখান হতে উঠিয়ে এখানে আনতুম কি করে? যাক, এবার একখানা ট্যাক্সি ডাক দেখি, বিশুদাকে বাড়ী নিয়ে যাই।"

বিশ্বপতি যেন আকাশ হইতে পড়িল, "বাড়ী যাব,—কার বাড়ী?"

নিমাই দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আমার বাড়ী। আপত্তি করো না বিশুদা, জোর করতে চেয়ো না। আর তুমি জোর করলেও আমি শুনব না, তোমায় দুই হাতে তুলে গাড়ীতে তুলব। দুষ্টুমী ছেড়ে দিয়ে যা বলি, সুবোধ ছেলের মত তাই শোন দেখি। মাথায় আর হাতে খুব চোট লেগেছে। তোমায় দু'দিন এখন চুপচাপ শুয়ে বসে থাকতে হবে—উঠতে পাবে না। গরম গরম লুচি দুধ খেয়ে গায়ে জোর আনতে হবে—এই হচ্ছে তোমার এখনকার ব্যবস্থা। কি বলিস রে তোরা, সব বোবার মত চুপ করে রইলি কেন, কথা বল্ না।"

রমেশ ছেলেটী মেডিক্যাল কলেজে পড়ে, বিজ্ঞের মত মাথা দোলাইয়া বলিল, "ঠিক, আর কল্যাও তার সঙ্গে থেতে হবে।"

নিমাই বলিল, "নিশ্চয়ই—বাঁচা তো চাই। আপত্তি করো না বিশুদা, তোমার আপত্তি কিছুতেই টেঁকবে না জেনে রেখো। যে চেহারা হয়েছে—এতে এই আঘাত পেয়েছ। আজ যদি তোমায় ছেড়ে দিই,—কেবল শুশ্রূষা আর পথ্যের অভাবেই তুমি মারা যাবে তা আমি বেশ বুঝছি।"

বিশ্বপতি স্তম্ভিত ভাবে নিমাইয়ের পানে তাকাইয়া রহিল। সে শুনিয়াছে কল্যাণী নিমাইয়ের সহিত গৃহত্যাগ করিয়াছে, এখনও সে নিমাইয়ের বাড়ী আছে।

কিন্তু নিমাইকে দেখিলে বিশ্বাস হয় না কল্যাণীকে সে লইয়া আসিয়াছে। তাহার কথাবার্ত্তা আগেকার মতই সরল, বাধাশূন্য শিশুর মতই। তেমনই হাসি আজও তাহার মুখে লাগিয়া আছে। নিমাই যদি কল্যাণীকে তাহার বাড়ী রাখিত, সে কি তাহা হইলে বিশ্বপতিকে জোর করিয়া সেই বাড়ীতেই লইয়া যাইবার কথা মুখে আনিতে পারিত?

অবিলম্বে ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল।

বন্ধুদের সাহায্যে নিমাই বিশ্বপতিকে গাড়ীতে তুলিল, বিশ্বপতির আপত্তি কেহ কাণে তুলিল না।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া বিশ্বপতি হতাশ ভাবে হেলান দিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার হতাশ ভাব দেখিয়া মৃদু হাসিয়া নিমাই বলিল, "ভাবছ কেন দাদা, তুমি যেখানে থাক, আমি সেখানে খবর পাঠিয়ে দেব এখন। অনেক দিন ধরে তোমার অনেক খোঁজ করেছি, কিন্তু কোন অন্ধকার

খনিতে যে মণি হয়ে জ্বলছ সে খবর কেউ দিতে পারে নি। সেবার দেশে গিয়ে শুনলুম, তুমি নন্দার বাড়ী যাচ্ছ বলে বাক্স বিছানা নিয়ে রওনা হয়েছ। তার পর তোমার আর কোনও উদ্দেশ নেই। এখানে নন্দার বাড়ী খোঁজ নিলুম—শুনলুম তারাও তোমার কোনও সন্ধান জানে না। আজ ভগবান নেহাৎ দয়া করে পথের মাঝখানে তোমায় মিলিয়ে দিলেন দাদা ; এ কথা হাজারবার বলব। তাজা অবস্থায় থাকলে হাজার ডাকলেও মুখ ফিরিয়ে চলে যেতে সে জানা কথা। নেহাৎ না কি বড় কায়দায় পড়েছ—নড়বার ক্ষমতা নেই, বেশী কথা বলবার ক্ষমতা নেই,—তাই আমার হাতের সেবাও তোমায় নিতে হল, বাধ্য হয়ে আমার বাড়ীতেও তোমায় যেতে হচ্ছে।”

দৃপ্ত হইয়া উঠিয়া বিশ্বপতি বলিল, “থাম থাম নিমাই, তোর ও-সব কথা শুনতে আমার মোটেই ভালো লাগছে না, আমার মাথার মধ্যে কি রকম করছে।”

খুব নরম সুরে নিমাই বলিল, “ভালো লাগবে দাদা, যখন শুনতে পাবে বাস্তবিকই আমি অপরাধী নই, আমি নির্দ্দোষ। তোমরা যে যাই বল, সকলেই জানো আমি দোষী, কিন্তু আমি জোর করে বলছি—আমি দোষী নই। আমার মাকে জানো তো,—এও জানো আমার মা আমার সব কথাই জানেন। তিনি আমার এত বড় একটা দোষ উপেক্ষা করে কখনই আমার কাছে থাকতে পারতেন না। এই যে বাড়ী এসেছে, গাড়ী রাখো। বিশুদা, এখানে তোমায় নামতে হবে, আমার মা এখানে আছেন।”

বন্ধুরা সঙ্গে আসে নাই। বিশ্বপতিকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া তাহারা চলিয়া গিয়াছিল। নিমাই বাড়ীর চাকরদের সহায়তায় বিশ্বপতিকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইয়া গিয়া একটী ঘরে বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

দুর্ব্বল বিশ্বপতি খানিকটা দম লইতেছিল। নিমাই বলিল, "কোথায় থাক ঠিকানাটা বল, কাউকে সেখানে পাঠিয়ে দি।"

বিশ্বপতি মাথা নাড়িল, বলিল "খবর কোথাও পাঠাতে হবে না নিমাই, সন্ধ্যে নাগাৎ আমি চলে যাব এখন।"

নিমাই পার্শ্বে একখানা চেয়ারে বসিয়া বলিল, "দেখা যাবে এখন! সেজন্যে এখনই ভাববার কোনও দরকার নেই, বিশুদা। এখন একটু গরম দুধ আনছে, সেইটুকু খেয়ে ফেল।"

বিশ্বপতি মাথা নাড়িল, "না, এখন থাক।"

পর মুহূর্ত্তে দুই কনুইয়ের উপর ভর দিয়া উঁচু হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে দুধ আনবে—রাঙাবউ? কল্যাণী?"

নিমাই সশব্দে হাসিয়া উঠিল, "ক্ষেপেছ? তোমার মনের ধারণা দেখছি কিছুতেই দূর করতে পারব না। আচ্ছা. ঠিক কথা বল বিশুদা, সত্যিই তুমি বিশ্বাস করেছ বউদিকে আমি নিয়ে এসেছি, আমার এখানে রেখেছি? শুনেছ তো এখানে আমার মা আছেন। সন্তান যত খারাপই হোক, মাকে সে চিরদিনই দেবীর আসনে রেখে ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়ে থাকে। মায়ের সামনে যতক্ষণ সে থাকে, ততক্ষণ তাকে সন্তান হয়েই থাকতে হয়। হাজার পাপ করলেও সে থাকে মায়ের কাছে সেই কোলের শিশুটীর মতই। তুমিও তো মা চেনো বিশুদা, তোমারও তো মা ছিল, বল দেখি—মায়ের সামনে কোনও সন্তান যথেচ্ছাচার করতে পারে কি?"

বিশ্বপতি শুইয়া পড়িল, উত্তর দিল না।

নিমাই বলিল, "হয় তো তুমি ভাবছ, এখানে আমার মা আছেন বলে আমি তাকে এখানে রাখি নি, অন্য জায়গায় রেখেছি। ধারণাটা অসম্ভব নয়, কারণ আমার অর্থের অভাব নেই, তার জন্যে একটা বাড়ী

ভাড়া করা—তার খরচ চালানো আমার পক্ষে শক্ত নয়। কিন্তু বিশুদা, আমার কথা শোন, আমি অকপটে তোমার কাছে সত্য কথাই বলব, তাতে তুমি বুঝতে পারবে—আমি দোষী নই।"

এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে বলিল, "এ কথা সত্য—বউদিকে আমি এখানে—আমার মায়ের কাছে রাখব বলে এনেছিলুম। ভেবেছিলুম যে যে পর্য্যন্ত তুমি না এসো তাকে আটক করে রাখব, আমার ধর্ম্মপরায়ণা পবিত্রা মায়ের কাছে থেকে সেও পবিত্র জীবন যাপন করবে। কিন্তু ভুল যে কতখানি করেছিলুম তা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝতে পারলুম। আগে বুঝি নি, যে পালাতে চায় তাকে কিছুতেই ধরে রাখা যায় না। যে নিজেকে ধ্বংস করতে চায়, তাকে রক্ষা করা যায় না। বুঝলুম সেই দিন—যেদিন সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই মা এসে খবর দিলেন বউদিকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমি সমস্ত কলকাতা সহর তন্ন তন্ন করে খুঁজলুম। শেষে জানতে পারলুম সে বাংলায় নেই। যখন আমি তাঁকে খুঁজছিলুম, সে তখন পাটনায় বিশ্রাম করছিল।"

বিশ্বপতি একটা নিঃশ্বাস ফেলিল, "একেবারে পাটনা?"

বিকৃতমুখে নিমাই বলিল, "হ্যাঁ। তার পর সেখান হতে সে বম্বে গিয়ে কোন্ একটা ফিল্‌মে নেমেছে। এতে তার খুব নাম হয়েছে। হয় তো তুমিও "পিয়ারা" নামটা শুনে থাকবে।"

বিশ্বপতি বালিসের মধ্যে মুখ লুকাইল।

নিমাই বলিল, "মুখ তোল বিশুদা, অমন করে ভেঙ্গে পড়ো না। যে তোমার মন ভেঙ্গে দিয়ে, পবিত্র কূলে কালি দিয়ে গেছে, তার সম্বন্ধে এত খোঁজ নেওয়ার দরকার আমার ছিল না। কিন্তু জানি—তোমার সঙ্গে একদিন আমায় মুখোমুখি হতে হবে। সেদিন আমায় কৈফিয়ৎ

দিতে হবে। আরও শোন—আরও বলি—সে এখন একটী বিখ্যাত রাজার অন্তঃপুরের শোভাবর্দ্ধন করছে,—আমার তোমার মত পাঁচশ'টা চাকর সে এখন রাখতে পারে।"

বিশ্বপতি তেমনই ভাবে পড়িয়া রহিল। অনেকক্ষণ তাহার গাড়া না পাইয়া নিমাই তাহার গায়ের উপর হাতখানা রাখিল। শান্ত কণ্ঠে ডাকিল,—"বিশুদা—"

বিশ্বপতি মুখ তুলিল।

"তোর বিশুদাকে মাপ কর নিমাই,—তোকে বুঝতে না পেরে অনেক কথাই বলে গেছি ভাই—"

সে উঠিতেই নিমাই তাহাকে ধরিয়া জোর করিয়া শোয়াইয়া দিল,—"করছ কি, উঠো না বলছি। আমি তোমায় বেশ চিনি বিশুদা, তোমার অগাধ বিশ্বাস আর স্নেহই না আমায় সে মহাপাতক হতে রক্ষা করেছে! আমিও এগিয়েছিলুম, কিন্তু যখন দেখলুম বউদি তার ভার আমার ওপরেই দিতে এল, সেই মুহূর্ত্তে মনে হল— আমি করছি কি? না, যাক সে-সব কথা। একটা কথা বলি—বউদি এখানে এসেছে,—কাল বিকেলে আমি গড়ের মাঠে মহারাজার সঙ্গে তাকে বেড়াতে দেখেছি। দেখবে কি? তুমি যদি দেখা করতে চাও বিশুদা—"

"থাম নিমাই থাম, কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিস নে—"

বিকৃত মুখখানার উপর হাত দু'খানা চাপা দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইয়া বিকৃত কণ্ঠে বিশ্বপতি বলিল, "সে আমার কাছে মরে গেছে নিমাই, তার নাম লইবার ক্ষমতাও আমার আর নেই।"

নিমাই একটা নিশ্বাস ফেলিল।

দু'দিন নিমাইয়ের বাড়ীতে কাটাইয়া বিশ্বপতি যেদিন চন্দ্রার বাড়ীতে ফিরিল, সেদিন চন্দ্রা নির্ব্বাক বিস্ময়ে কেবল তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

বিশ্বপতি তাহার সহিত একটা কথাও বলিল না, নিজের জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরটীতে প্রবেশ করিয়া দরজা ভেজাইয়া দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

সে একাই আসিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু নিমাই তাহাকে একা ছাড়িয়া দেয় নাই। তাহার সঙ্গে সেও আসিয়াছিল। বিশ্বপতিকে শতবার জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার বাসস্থানের কথা নিমাই জানিতে পারে নাই। এই বাড়ীর দরজায় আসিয়াই সে তাহার প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছিল।

একটু হাসিয়া সে বলিয়াছিল, "যাক, দুঃখ বিশেষ নেই বিশুদা, জীবনে চলবার পথ বউদি যেমন খুঁজে নিয়েছে—তুমিও তেমনি পেয়েছ, কেউ কাউকে ছাড়িয়ে যেতে পার নি। আমার দুর্ভাগ্য যে তোমাদের সঙ্গে আমার মত লোকের পথে চলতে মিল হবে না। সেই জন্যে এখান হতেই খসে পড়লুম ;—নমস্কার—"

তাহার কথাগুলা বেশ মিষ্ট হইলেও অন্তরে আঘাত দিয়াছিল বড় বেশী রকম। বিশ্বপতি বিবর্ণ মুখে তাহার পানে তাকাইয়া ছিল, একটী কথা তাহার মুখে ফুটে নাই।

সে যে নিজেই চন্দ্রার বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছে সে কথা সে ভুলিয়া গেল। যেন চন্দ্রাই তাহাকে আশ্রয় দিয়া তাহার দশদিককার দশটা

পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। জগতে তাহার মুখ দেখাইবার উপায় রাখে নাই। এই জন্য তাহার যত ক্রোধ সবই চন্দ্রার উপর গিয়া পড়িল।

বাড়ীতে প্রবেশ করিবার পথের উপর চন্দ্রা দাঁড়াইয়া ছিল। তাহার উপর দৃষ্টি পড়িতে বিশ্বপতির মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল। সে পাশ কাটাইয়া দ্রুতপদে নিজের ঘরে চলিয়া গেল।

খানিক পরে আস্তে আস্তে দরজা ঠেলিয়া চন্দ্রা ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল বিশ্বপতি উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া আছে।

তাহার মাথার কাছে সে বসিয়া পড়িল। আস্তে আস্তে মাথার উপর হাতখানা রাখিতেই বিশ্বপতি চমকাইয়া উঠিয়া মুখ তুলিল। চন্দ্রা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল তাহার চোখে জলধারা।

চন্দ্রা আড়ষ্ট ভাবে খানিক বসিয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি কাঁদছ—ওগো, তুমি কাঁদছ—"

বলিতে বলিতে সে নিজেই ঝর ঝর করিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

বিশ্বপতি লজ্জিত ভাবে চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "ও কি, তুমি কাঁদলে কেন চন্দ্রা? আমার মনে আজ বড় আঘাত লেগেছে; সেইজন্যেই হয় তো আমার চোখে জল এসেছে। কিন্তু তুমি কেন চোখের জল ফেললে?"

চন্দ্রা উত্তর দিল না, নিঃশব্দে অঞ্চল দিয়া চোখের জল মুছিতে লাগিল।

বিশ্বপতি নীরবে কতক্ষণ পড়িয়া রহিল। তাহার পর রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কই, জিজ্ঞাসা করলে না চন্দ্রা;—দু'দিন আমি কোথায় ছিলুম, আমার কি হয়েছিল?"

চন্দ্রা কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া বলিল, "আমি খোঁজ নিয়েছিলুম, তুমি নিমুদার বাড়ীতে আছ।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিশ্বপতি বলিল, "শুনেছ চন্দ্রা, সে আমায় কতখানি ঘৃণা করে গেছে? সে বলে গেছে, আমি এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি, যেখানে দাঁড়ানোর ফলে সে আমার সঙ্গে যে তার পরিচয় আছে এ কথা মুখে আনতে ঘৃণা বোধ করে। জীবনে সে আর কোন দিন আমার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না।"

চন্দ্রা মাথা নাড়িল, বলিল, "শুনি নি, কিন্তু এই রকমই যে হবে, এমনই করে সকলের কাছ হতে ঘৃণা কুড়াবে, তা আমি জানতুম। যে-পথে এসে দাঁড়িয়েছি এর তুল্য ঘৃণিত পথ আর নেই। যে কেউ আমার সংশ্রবে আসবে সেই সকলের ঘৃণ্য হবে, পরিত্যক্ত হবে। সেই জন্যেই না কেউ না জানতে তোমায় নিজের জায়গায় ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করেছিলুম?"

"এইবার যাব চন্দ্রা,—জগতের ঘৃণা আমায় সত্য পথ দেখিয়েছে। আমি ওদের ঘৃণা সয়ে আর এখানে থাকতে পারব না। পথে ভিক্ষা করে খাব, গাছতলায় থাকব, সেও ভালো; তবু এখানে তোমার কাছে রাজার মত সুখে জীবনটা নষ্ট করব না"

বিশ্বপতি উঠিয়া বসিয়া খোলা জানালা-পথে বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল।

আশ্চর্য্য মানুষের স্বভাব। মানুষকে যতদিন কাছে পায়, তত দিন তাহার অস্তিত্ব মানুষের কাছে সব সময় অনুভূত হয় না। কিন্তু যখন চলিয়া যাওয়ার সময় হয়, তখন সমস্ত স্নেহ ভালবাসা ঢালিয়া আঁকড়াইয়া রাখিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে।

বিশ্বপতি যত দিন নিজে নড়িতে চায় নাই, তত দিন চন্দ্রা তাহাকে বাড়ীতে অথবা নন্দার কাছে পাঠাইবার জন্য বড় ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। আজ সে নিজেই চলিয়া যাইতে চাহিতেছে। কথাটা বজ্রাঘাতের মতই তাহার বক্ষে বাজিয়া তাহাকে কতক্ষণ নিস্পন্দ নীরব করিয়া রাখিল।

অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব,—কি ভাবিতেছিল কে জানে। বাহিরের পানে চাহিয়া শ্রান্ত বিশ্বপতি মুখ ফিরাইয়া সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শুনিয়া সচকিত হইয়া মুখ তুলিল।

"এখনও তুমি এ ঘরে রয়েছ চন্দ্রা? আমি ভেবেছিলুম চ'লে গেছ।"

চন্দ্রা মলিনমুখে এক-টুকরা হাসি ফুটাইয়া তুলিয়া বলিল, "না, এইবার যাব।"

বিশ্বপতি বলিল, "হাতে কোন কাজ নেই তো, তা হলে একটু বস। আমার কপালটায় একটু হাত বুলিয়ে দেবে কি? মাথার বড় যন্ত্রণা হচ্ছে।"

নিঃশব্দে চন্দ্রা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেল, "ও, তোমায় একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। ভবানীপুর হতে কে এক ভদ্রলোক তোমায় ডাকতে এসেছিলেন।"

"ভবানীপুর হতে,—আমায় ডাকতে—"

বিশ্বপতি বড় বেশী রকম বিবর্ণ হইয়া গেল।

চন্দ্রা বলিল, "হাঁ, সে ভদ্রলোক তোমায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে মোটর এনেছিলেন।"

উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়া বিশ্বপতি বলিল, "আমায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে এসেছিলেন? কেন এসেছেন, কেন আমায় নিয়ে যেতে চান, সে কথা কিছু জিজ্ঞাসাও কর নি চন্দ্রা?"

চন্দ্রা উত্তর দিল, "জিজ্ঞাসা করেছিলুম। তিনি বললেন—নন্দার অসুখ, সে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়।"

নন্দার অসুখ—

বিশ্বপতি একেবারে স্তব্ধ হইয়া গেল।

সে জানে অসুখ খুব বাড়াবাড়ি না হইলে নন্দা সংবাদ দেয় নাই, তাহাকে ডাকে নাই। এখানে এতদূরে সন্ধান লইয়া তাহাকে ডাকিতে লোক পাঠাইয়াছে, হয় তো—

বিশ্বপতি আর ভাবিতে পারিল না, দুই হাতে [illegible] চাপিয়া ধরিল।

চন্দ্রা ভয় পাইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়ে[illegible] অমন করছ কেন?"

শুষ্ক হাসিয়া বিশ্বপতি বলিল, "না, কিছুই করছি নে তো? এখন চন্দ্রা, একবার সেখানে যাই, দেখি কি হয়েছে?"

সে উঠিয়া পড়িল।

চন্দ্রা জিজ্ঞাসা করিল, "সেখানে মুখ দেখাতে পারবে?"

বিশ্বপতি অগ্রসর হইয়াছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "পারব বই কি। সে যদি ভালো থাকত মুখ দেখাতে পারতুম না, কিন্তু তার অসুখ, সে আমায় ডেকে পাঠিয়েছে। আমার সব গ্লানি—সব দীনতা চাপা দিয়েও আমায় সেখানে যেতে হবে চন্দ্রা, না গেলে চলবেই না।"

চন্দ্রা কেবল চাহিয়াই রহিল। বিশ্বপতি বাহির হইয়া গেল,—একবার পিছন ফিরিয়াও তাহার পানে তাকাইল না।

গলিটা পার হইয়া বড় রাস্তায় পড়িয়া সে একখানা বাসে উঠিয়া বসিল।

ধর্ম্মতলা মোড়ের নিকট বাস থামিয়া গেল। বাসের পাশ দিয়া একখানি রোলস্ রয়েস্ কার ছুটিয়া যাইতে সামনে করখানি মোটরের বাধা পাইয়া থামিয়া গেল।

মোটরে ছিল একটী মেয়ে। বিশ্বপতি যে মুহূর্ত্তে অন্যমনস্ক ভাবে মোটরের আরোহী সেই মেয়েটীর পানে তাকাইল, সেও সেই সময় চোখ তুলিল।

বিশ্বপতির মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইল। আবার যখন সে মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন কারখানি ভিড় ঠেলিয়া আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়াছে। মেয়েটী এমন ভাবে অপর পার্শ্বে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে যে, তাহার সুগৌর একখানি হাত ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না।

কল্যাণী—

বিশ্বপতির মুখে এই একটী শব্দই ভাসিয়া আসিল। সে অধর দংশন করিল।

হ্যাঁ, এ সেই কল্যাণী, বিশ্বপতির রাঙাবউ। সেই মুখ, সেই চোখ, সেই সুন্দর সুডৌল হাত দু'খানি। প্রভেদ এই—সে আজ বহুমূল্য বসন-ভূষণে সজ্জিতা। তবুও তাহাকে দেখিয়া চিনিতে বিশ্বপতির এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হয় নাই। একদিন নয়, দু'দিন নয়, দীর্ঘ পাঁচ বৎসর সে বিশ্বপতির গৃহলক্ষ্মী, সহধর্ম্মিণী হইয়া বাস করিয়াছিল। আজ সে যতই কেন না নিজেকে পরিবর্ত্তিত করুক, বিশ্বপতির চোখকে প্রতারিত করিতে পারিবে না।

সেও চিনিয়াছে, তাই তাহার মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আত্মগোপন মানসেই সে ওদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল।

অভাগিনী—

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়াই বিশ্বপতি চমকাইয়া উঠিল। কে অভাগিনী কল্যাণী? না, সে তখন রাজার রাণী। তাহার মত সৌভাগ্য কাহার?

সে যথেষ্ট যশ পাইয়াছে, অর্থ পাইয়াছে, সামান্য সেই পল্লীর কথা—সেই কুটীরখানির কথা—আর এই দীনতম স্বামীর কথা তাহার মনে হয় কি?

মনে হইয়াও কাজ নাই; কল্যাণী সুখী হোক; ভগবান, উহাকে সুখী কর।

নন্দার কঠিন ব্যারাম।

একদিন হঠাৎ পড়িয়া গিয়া সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছিল। চব্বিশ ঘণ্টা পরে সে জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছিল; কিন্তু সে জ্ঞান বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতেছিল না।

অসমঞ্জ অধীর হইয়া উঠিয়া যেখানে যত ডাক্তার কবিরাজ ছিল সব আনিয়া ফেলিয়াছিল,—ফকীর, সন্ন্যাসী কাহাকেও সে বাদ দেয় নাই। যেমন করিয়াই হোক, নন্দাকে তাহার বাঁচানো চাই, নহিলে তাহার সবই মিথ্যা হইয়া যাইবে।

সেদিন প্রভাতে জ্ঞান হইতে নন্দা যখন বিশ্বপতিকে একবার দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, তখন তাহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্যই অসমঞ্জ তাহার জনৈক কর্ম্মচারীকে বিশ্বপতির বাসার ঠিকানায় পাঠাইয়া দিয়াছিল। সেই ভদ্রলোকই অনেক খুঁজিয়া দীর্ঘ দুই ঘণ্টা পরে বিশ্বপতির সন্ধান পাইয়াছিলেন।

বিশ্বপতি যখন সে বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিল, তখন নন্দা আবার মূর্চ্ছিতার মতই পড়িয়া আছে। বিশ্বপতিকে দেখিয়াই অসমঞ্জ তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল, "এসেছ বিশুদা, দেখছ—তোমার স্নেহের বোনটীর কি অবস্থা হয়েছে। বাঁচবার কোন আশা নেই,—কখন কি হয়ে পড়বে তার ঠিক নেই। ডাক্তার বলে দিয়েছে, হার্ট ভারি দুর্ব্বল, যে-কোন সময়ে হার্টফেল হয়ে মারা যেতে পারে।"

বিশ্বপতি আড়ষ্ট ভাবে নন্দার বিছানার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। শুষ্ক

নেত্রে চাহিয়া দেখিতে লাগিল, সেই নন্দার কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়া গেছে, চেনার যো নেই।

আজ কয়দিনকার ব্যারামের যন্ত্রণায় তাহার সোনার মত রং কালি হইয়া গেছে, চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে। সে বিছানায় পড়িয়া আছে যেন একগাছি শুষ্ক ফুলের মালা,—ফুলের দলগুলি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে,—আছে দুই একটী শুষ্ক দল সহ বোঁটাগুলি। সাক্ষ্য দিতেছে—একদিন সে রূপে গন্ধে অতুলনীয় দলগুলিকে তাজা অবস্থায় একত্র গাঁথিয়া রাখিয়াছিল,—একদিন সেই ফুলগুলি জগতের নয়ন তাহাদের দিকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল।

আজ তাহার রূপ গিয়াছে, গন্ধ গিয়াছে,—আছে শুধু তাহার থাকার চিহ্নটুকু।

আস্তে আস্তে কখন বিশ্বপতির চোখ দুইটী জলে ভরিয়া উঠিল, চোখের পাতা দুইটী ভিজিয়া ভারি হইয়া গেল; সে নন্দার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল।

আর্দ্র কণ্ঠে অসমঞ্জ বলিল, "আজ তের দিন ঠিক এইভাবেই পড়ে আছে বিশুদা, এই তেরটা দিন আমার যে কি উৎকণ্ঠায় কেটেছে তা কেউ জানে না। কাউকেই দেখাতে তো বাকি রাখছি নে বিশুদা, যে যা বলছে তাই করছি, পয়সার দিকে চাই নি। যেমন করেই হোক আমার শেষ পয়সাটীও ব্যয় করে আমি ওকে বাঁচিয়ে তুলতে চাই বিশুদা, আমার ওকে চাই-ই, ও না হলে আমার চলবে না।"

সে যেন উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে, তেমনই দৃপ্ত ভাবে তাহার চোখ দুইটী জ্বলিতেছে।

খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল, "আজ কয়দিন ধরে তোমায় দেখতে চাচ্ছে, কয়দিন কেবল তোমার সন্ধানে নানা জায়গায়

লোক পাঠাচ্ছি। ভগবান তোমার সন্ধান দিলেন, নইলে তোমার যদি না পেতুম আর ওর যদি কিছু হতো—"

সে দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিল, রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "তা হলে আমার এ ক্ষোভ রাখবার আর জায়গা থাকত না।"

বিশ্বপতি বদ্ধদৃষ্টিতে নন্দার মুখের পানে তাকাইয়া ছিল। তাহার কাণে তখন কোন কথা আসিতেছিল না, চোখের সম্মুখ হইতে বর্ত্তমান মিশাইয়া গিয়া অতীতের একটী দিনের ছবি জাগিয়া উঠিয়াছিল। সে সেইদিন—যে দিনে সে এমনই রোগশয্যায় পড়িয়া ছিল, তাহার পার্শ্বে নন্দা ছাড়া আর কেহই ছিল না; নন্দা যখন তাহার বিছানার পাশে পরিপূর্ণ আশার মতই হাসিভরা মুখে আসিয়া দাঁড়াইত, তখন বিশ্বপতি রোগের যাতনা ভুলিয়া যাইত, বাঁচিবার আশা মনে জাগিত, সাহস আসিত,—আনন্দ হইত। তাহার মনে হইত, একমাত্র নন্দাই তাহাকে বাঁচাইতে পারে,—শমন নন্দার দুইটী কোমল হাতের কঠিন বন্ধন ছিন্ন করিয়া কিছুতেই তাহাকে লইয়া যাইতে পারিবে না।

হইলও তাহাই, নন্দা তাহাকে বাঁচাইল। কত দিন রাত অনাহারে অনিদ্রায় তাহার পার্শ্বে সে কাটাইয়া দিয়াছে, যমের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছে। বিশুদার জন্য নন্দার উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না, সে যেখানে গিয়াছে—নন্দার ব্যগ্র ব্যাকুল দুইটী চোখের দৃষ্টি তাহাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিয়াছে।

কিন্তু সে? এমনই বিশ্বাসঘাতক সে যে সেই প্রাণদাত্রীর কথাটী পর্য্যন্ত মনে আনে নাই। সে এই স্বর্গে আসিতে স্বেচ্ছায় পথভ্রান্ত হইয়া উঠিল চন্দ্রার গৃহে, পূতিগন্ধপূর্ণ নরকে। স্বর্গে প্রবেশের অধিকার পাইয়াও যে হারায় তাহার তুল্য হতভাগ্য কে?

বিশ্বপতির চোখ দুইটী কখন শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া চোখ জ্বালা করিতে লাগিল, তবু সে চোখ ফিরাইতে পারিল না, নন্দার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

অসমঞ্জের অনর্গল কথা চলিতেছিল—সব প্রলাপের মতই অসম্বন্ধ। নন্দা বিশ্বপতির জন্য কত না কষ্ট পাইয়াছে, কতই না চোখের জল ফেলিয়াছে। বিশ্বপতির অধঃপতন তাহার অন্তরে নিদারুণ ক্ষত উৎপন্ন করিয়াছে। তাহাকে কাছে ফিরাইবার জন্য কত না চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু বিশ্বপতির দেখা সে পায় নাই।

শুনিতে শুনিতে বিশ্বপতির মনে হইতেছিল সারা বুকখানা তাহার জ্বলিয়া গেল! সে যেন আর সহ্য করিতে পারে না, ছুটিয়া পলাইতে পারিলেই বাঁচে। কিন্তু যাইবেই বা কেমন করিয়া,—এখান হইতে এক পা নড়িবার সামর্থ্য তাহার নাই।

সন্ধ্যার সময় নন্দা চক্ষু মেলিল, শীর্ণ হাতখানা সামনের দিকে প্রসারিত করিয়া দিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিল,—"ওগো, শুনছো—"

অসমঞ্জ তাহার হাতখানা নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিল। নিজের হাতখানা তাহার মাথায় রাখিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "এই যে নন্দা, আমি শুনছি, কি বলবে বল।"

নন্দা দম লইয়া বলিল, "বিশুদা আসে নি? তাকে খুঁজে পেলে না? আমি কিন্তু এইমাত্র স্বপ্ন দেখছিলুম বিশুদা এসেছে, কত কথা বলছে।"

অসমঞ্জ বলিল, "সত্যই বিশুদা এসেছে নন্দা, এই তোমার পাশেই বিশুদা বসে আছে।"

মুখ উঁচু করিয়া নন্দা বিশ্বপতির পানে তাকাইল। হঠাৎ তাহার চোখ ছাপাইয়া ঝর ঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল।

অসমঞ্জ তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "কাঁদছ কেন নন্দা? বিশুদাকে দেখতে চেয়েছিলে—সে এসেছে, যা বলবার আছে তা বল।"

বিশ্বপতি যেন জড় পদার্থে পরিণত হইয়া গেছে। তাহার মুখে কথা নাই, চোখে পলক নাই। প্রাণবান মানুষটী হঠাৎ যেন পাষাণে পরিণত হইয়াছে।

তাহার কোলের উপর হাতখানা রাখিয়া নন্দা যখন ডাকিল, "বিশুদা—"

তখন আচমকা একটা ধাক্কা খাইয়া তাহার লুপ্ত জ্ঞান ফিরিয়া আসিল।

"কি বলছ নন্দা—"

রুদ্ধ কণ্ঠে নন্দা বলিল, "আজ এই শেষ দিনে দেখা দিতে এলে দাদা, ভালো থাকতে একদিন আসতে পারলে না? তোমায় বলব বলে অনেক কথা মনে করে রেখেছিলুম, আজ সে সব হারিয়ে ফেলেছি বিশুদা, কিছু বলতে পারব না। আজ তোমার সময় হল, এত দিনে এতটুকু সময় করে উঠতে পার নি ভাই?"

বিশ্বপতি এত জোরে অধর দংশন করিল যে রক্ত বাহির হইয়া পড়িল।

নন্দা আবার ডাকিল, "বিশুদা—"

বিকৃত কণ্ঠে বিশ্বপতি উত্তর দিল,—"কি?"

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নন্দা বলিল, "কথা বলছ না কেন? না, আমি তোমায় আজ বকব বলে ডাকি নি, বকবার প্রবৃত্তি আমার আর নেই, ক্ষমতাও নেই। তোমায় আজ ডেকেছি শুধু শেষ দেখা করবার জন্যে, শেষ দু'টো কথা বলবার জন্যে। বিশুদা—"

বিশ্বপতি তেমনই বিকৃত কণ্ঠে উত্তর দিল, "তোমার পাশেই আছি নন্দা, যাই নি।"

নন্দা বলিল, "তোমায় আজ একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে ভাই। তোমার আগেকার জীবনের সব কথা আমি জানি, বর্ত্তমানের কথাও আমার অজানা নেই,—আমি সব শুনতে পেয়েছি। আমার এই হাতখানা ধরে প্রতিজ্ঞা কর বিশুদা, বল,—তুমি সৎ হবে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আবার সংসারী হবে?"

জিজ্ঞাসু নেত্রে সে বিশ্বপতির পানে তাকাইল।

তাহার শীর্ণ হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বিশ্বপতি বলিল, "প্রতিজ্ঞা করছি নন্দা, তোমার হাত ছুঁয়ে বলছি—আমি ঘরে ফিরে যাব, ভালো হব; কিন্তু সংসারী হব কি নিয়ে? আমার যে কেউ নেই—কিছু নেই।"

ক্লান্তিভরে আবার চক্ষু মুদিয়া আসিতেছিল, প্রাণপণ যত্নে সে ভাব দূর করিয়া নন্দা বলিল, "আবার নতুন করে তোমায় সংসার পাততে হবে বিশুদা—"

বিশ্বপতির চক্ষু দুইটী একবার দৃপ্ত হইয়া উঠিয়া তখনই স্বাভাবিক হইয়া গেল; সে মাথা নাড়িয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিল, "আর যা বল সব করব, কেবল আবার বিয়ে করে সংসার পাতব না। ওইটী আমায় মাপ কর নন্দা, তুমি তো জানো সবই, আমায় আবার মিথ্যে অভিনয় করতে, মিথ্যে জীবন কাটাতে আদেশ দিয়ো না।"

নন্দা রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমি চলে যাচ্ছি বিশুদা, তোমাদের কারও মাঝখানে আর ব্যবধান হয়ে থাকব না। ছেলেবেলার কথা ভুলে যাও ভাই, পূর্ব্বস্মৃতি মনে জাগিয়ে রেখে নিজেকে সব রকমে বঞ্চিত করো না।"

বিশ্বপতির মলিন মুখে একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিয়া তখনই মিলাইয়া গেল। দৃঢ় কণ্ঠে সে বলিল, "মিথ্যে কথা নন্দা, এ একেবারেই অসম্ভব, সেই জন্যেই আমি পারব না। স্মৃতি হতে কোন ছবি মুছে ফেলতে কেউ কোন দিন পারে নি, পারবেও না; আমার বেলাতেই কি সেই চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম হবে?"

নন্দা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইল। অসমঞ্জের মুখের পানে তাকাইয়া সে হঠাৎ আর্ত্তভাবে কাঁদিয়া ফেলিল।

পক্ষীজননী আর্ত্ত শাবককে যেমন দু'টি ডানার নীচে টানিয়া লইয়া ঢাকিয়া ফেলে, অসমঞ্জ তেমনই করিয়া নন্দাকে নিজের বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "আমি জানি, সব জানি নন্দা, কোন কথাই আমার কাণ অতিক্রম করে যায় নি। ভয় কি নন্দা,—আমি আছি, আমি তোমায় ছাড়ব না। আমি তোমায় অবিশ্বাস করি নি, তোমায় সমস্ত মন দিয়ে ক্ষমা করেছি।"

স্বামীর বুকের নীচে বড় নিশ্চিন্ত হইয়া বড় আরামেই নন্দা ঘুমাইয়া পড়িল।

তিন দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নন্দার বিছানার পাশে সমানে একবারে বসিয়া থাকিয়াও বিশ্বপতি কিছু করিতে পারিল না। অসমঞ্জের ও তাহার সকল চেষ্টা যত্ন ব্যর্থ করিয়া নির্দ্দয় কাল নন্দার অমূল্য প্রাণ লইয়া চলিয়া গেল।

অসমঞ্জ নন্দার বুকের উপর মাথা দিয়া পড়িয়া রহিল। কি সে তাহার অধীরতা, কি সে যন্ত্রণা,—কিন্তু বিশ্বপতি নীরব—নিস্পন্দ।

সে যেন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না, নন্দা চলিয়া গেছে, নন্দা আর নাই। সেই নন্দা,—যাহাকে সে এতটুকু বেলা হইতে দেখিয়াছে, কত মারিয়াছে আবার কোলে লইয়াছে, যাহাকে সে নিজের চেয়েও বেশী ভালোবাসিত—সে আজ নাই। তাহার অন্তরে যে চিরস্থায়ী আসন পাতিয়া বসিয়াছিল, কল্যাণী যেখানে প্রবেশাধিকার পায় নাই, চন্দ্রা স্পর্শের অধিকার পায় নাই, সেই নন্দা—সে সকল ভালোবাসা ব্যর্থ করিয়া চিরদিনের মতই চলিয়া গেছে।

যখন তাহার বাহ্য চেতনা ফিরিয়া আসিল তখন নন্দার মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার জন্য সুসজ্জিত করা হইয়াছে। অসমঞ্জ উঠিয়া বসিয়াছে, নন্দার নিষ্প্রভ মুখখানার পানে তাকাইয়া নিঃশব্দে সে চোখের জল ফেলিতেছে।

ধড়ফড় করিয়া বিশ্বপতি উঠিয়া পড়িল। সে এ দৃশ্য আর সহ্য করিতে পারে না, সে পালাইবে।

মৃতদেহ লইয়া পথে বাহির হইয়া অসমঞ্জ বিশ্বপতির হাত দু'খানা

চাপিয়া ধরিয়া আর্দ্র কণ্ঠে বলিল, "তুমিও সঙ্গে এসো বিশুদা, ওর দেহের সদ্‌গতি করতে হবে—চল। তুমি সঙ্গে না গেলে ওর আত্মা তৃপ্ত হবে না।"

সবেগে মাথা নাড়িয়া বিশ্বপতি বলিল, "না না, আমি যেতে পারব না ভাই, আমায় ক্ষমা কর—চলে যেতে দাও।"

অসমঞ্জ বলিল, "কি করে হবে বিশুদা, ওর—"

বিশ্বপতি বাধা দিয়া আর্ত্ত কণ্ঠে বলিল, "কেন হবে না? ওর ওই দেহখানা পুড়ে আমার চোখের সামনে ছাই হয়ে যাবে, আমায় তাও দেখতে হবে? না, আমি তা সইতে পারব না, কিছুতেই পারব না। অসমঞ্জ, আমার ভালোবাসা স্বর্গীয় নয়, আমি কেবল নন্দার ভেতরকার মানুষটাকেই ভালোবাসি নি, ওর ওই রক্তমাংসের দেহটাকেও ভালোবেসেছিলুম। আমি সব রকমে এমন ভাবে পুড়তে পারব না—কিছুতেই না।"

অসমঞ্জের হাত হইতে জোর করিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া সে ছুটিয়া পলাইল।

কোথা হইতে কোথায় পা পড়িতেছে তাহার ঠিক নাই, চোখের সম্মুখ হইতে ঘর বাড়ী পথ সব অদৃশ্য হইয়া গেছে।

কোনও ক্রমে বিশ্বপতি যখন চন্দ্রার বাড়ীর দরজায় আসিয়া বসিয়া পড়িল তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, পথে পথে বৈদ্যুতিক আলোগুলি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সামনের বাড়ীটায় কে যেন হার্ম্মোনিয়ামের সঙ্গে সুর মিলাইয়া গাহিতেছে—

প্রিয় যেন প্রেম ভুলো না
এ মিনতি করি হে—

* * * * *

আমার সমাধি পরে, দাঁড়ায়ো ক্ষণেক তরে
জুড়াব বিরহ জ্বালা ও চরণ ধরি হে।

"নন্দা নন্দা—"

বিশ্বপতি আকাশের পানে তাকাইল। কোন দিন গানের এই কথাগুলি নন্দার অন্তরে ধ্বনিয়া উঠিয়াছিল কি ?

কাঁদিতে পারিলে ভালো হইত, কিন্তু এমনই হতভাগ্য সে—কিছুতেই এক ফোঁটা জল তাহার চোখে আসিল না। বুকের ভিতরটা অসহ যাতনায় ফাটিয়া যাইতেছে, চোখের জলে হয় তো এ যন্ত্রণার উপশম হইত।

পাশের দরজাটা খট করিয়া খুলিয়া গেল, তাহার উপর দাঁড়াইল চন্দ্রা। সম্ভব—কেহ তাহাকে সংবাদ দিয়াছিল বিশ্বপতি ফিরিয়া আসিয়া দরজার ধারে বসিয়া আছে।

একবার তাহার পানে তাকাইয়া বিশ্বপতি চোখ ফিরাইয়া লইল।

চন্দ্রা অগ্রসর হইয়া আসিল, খানিক তাহার পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাহার পর বিশ্বপতির একখানা হাত টানিয়া লইয়া শান্ত সংযত কণ্ঠে বলিল, "ভেতরে এসো।"

বিশ্বপতির সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, মনে পড়িল—আজই সে নন্দার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া শপথ করিয়াছে সে সৎ হইবে—ঘরে ফিরিবে। সে শপথ তাহার রহিল কই,—আবার যে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাকে চন্দ্রার দুয়ারেই আসিয়া দাঁড়াইতে হইল।

চন্দ্রা বলিল, "তবু বসে রইলে কেন, বাড়ীর মধ্যে এসো।"

বিশ্বপতি ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পড়িল, বলিল, "না চন্দ্রা, আমি আর এ বাড়ীতে যাব না। আজই প্রতিজ্ঞা করেছি এবার হতে সৎ হব—বাড়ী ফিরে গিয়ে সেখানে বাস করব।"

শান্ত কণ্ঠে চন্দ্রা বলিল, "তুমি যে যাবে তা আমি জানি। বাড়ী যাবে যেয়ো, আমিও তোমায় এখানে রাখব না, কাল দিনের বেলা উদ্যোগ করে আমি তোমায় পাঠিয়ে দেব। এখন তোমার মাথার ঠিক নেই, সারাদিন হয় তো জলটুকুও খাও নি,—এ অবস্থায় তোমায় ছেড়ে দিতে পারি নে। তা ছাড়া ট্রেণ কখন তা তোমারও জানা নেই—আমারও জানা নেই। ষ্টেশনে পড়ে থেকে রাত কাটানোর চেয়ে এখানে আজ রাতটা কাটিয়ে যাওয়া ভালো হবে না কি?"

বিশ্বপতির মন ও দেহ দুই-ই আজ অপ্রকৃতিস্থ ছিল, যন্ত্রচালিতের মতই সে চন্দ্রার অনুসরণ করিল।

দ্বিতলে যে ঘরটায় চন্দ্রা বিশ্বপতিকে লইয়া গেল, প্রথমটায় সে ঘরের পানে দৃষ্টি পড়ে নাই ; খাটে বসিয়াই বিশ্বপতি চমকিয়া উঠিল।

তাহার মনের ভাব বুঝিয়া চন্দ্রা অনুনয়ের সুরে বলিল, "আজ এই ঘরেই থাক গো, তোমায় একা ও-ঘরে রেখে আমার শান্তি হবে না। তা হলে আমাকেও ও-ঘরে তোমার কাছে গিয়ে থাকতে হবে।"

বিশ্বপতি হঠাৎ উচ্ছ্বসিত ভাবে হাসিয়া উঠিল—

"আজ যার জন্যে এত ভাবনা চন্দ্রা, কাল সে এতক্ষণ কোথায় থাকবে, শোওয়ার বিছানা পেলে কি না, দু'টো ভাত খেতে পেলে কি না তা তো দেখতে পাবে না।"

চন্দ্রা অন্যমনস্ক ভাবে এক দিকে তাকাইয়া রহিল,—অনেকক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিল।

বিশ্বপতি শুইয়া পড়িয়াছিল, দুই কনুইয়ের উপর ভর দিয়া উঁচু হইয়া উঠিয়া বলিল, "শুনেছ চন্দ্রা, নন্দা আর নেই, আজ সকালেই সে মারা গেছে ?"

বিকৃত কণ্ঠে চন্দ্রা বলিল, "তোমায় দেখেই তা বুঝতে পেরেছি।"

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিশ্বপতি বলিল, "বুকটা যেন জ্বলে যাচ্ছে, ফেটে যেতে চাইছে, তবু কাঁদতে পারছি নে। ঠিক এই জায়গাটা চন্দ্রা—এখানটায় হাত রেখে দেখ—"

সে চন্দ্রার হাতখানা তুলিয়া নিজের বুকের উপর রাখিল।

চন্দ্রা নত হইয়া পড়িল, তাহার বুকের উপর মুখখানা রাখিয়া

উচ্ছ্বসিত ভাবে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল, তাহার কান্না আর থামে না।

চন্দ্রার মাথায় হাতখানা বুলাইতে বুলাইতে বিশ্বপতি বলিল, "কাঁদছ—কাঁদো। উঃ, অমনি করে যদি কাঁদতে পারতুম—"

আর্ত্ত কণ্ঠে চন্দ্রা বলিল, "কাঁদ, খানিকটা কাঁদলে তোমার বুকের যন্ত্রণা কম পড়বে।"

বিশ্বপতি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "না, কাঁদতে পারব না চন্দ্রা, বুকটা যেন পাষাণ হয়ে গেছে। আর কত আঘাত সইব চন্দ্রা, সইবারও অতীত হয়ে গেছে। ওকে পরের হাতে দিয়েও সইতে পেরেছিলুম; কিন্তু আজ যে কিছুতেই সান্ত্বনা পাচ্ছি নে। মন যখন বড় খারাপ হতো, ওরই কাছে ছুটে যেতুম। আজ যে আমার জুড়ানোর জায়গা কোথাও রইল না চন্দ্রা—"

চন্দ্রা সোজা হইয়া বসিয়া তাহার বুকে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। বিশ্বপতি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া রহিল।

দেয়ালের ঘড়িতে এগারটা বাজিয়া গেল।

চমকিয়া উঠিয়া বিশ্বপতি বলিল, "তোমার খাওয়া হয় নি চন্দ্রা?"

আর্দ্র কণ্ঠে চন্দ্রা বলিল, "খাব এখন।"

"না, তুমি আগে খেয়ে এসো" বলিয়া বিশ্বপতি চন্দ্রার হাতখানা সরাইয়া দিল।

তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ক্ষীণ কণ্ঠে চন্দ্রা বলিল, "না গো, আজ আমায় কিছু খেতে বলো না, আমার খাওয়ার ইচ্ছে নেই। খাব তো রোজই, কিন্তু তোমায় তো রোজ পাব না।"

বিশ্বপতি চুপ করিয়া রহিল।

শেষ রাত্রের দিকে হঠাৎ চন্দ্রার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল ; খাটের উপর বিশ্বপতি ঘুমের ঘোরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিতেছে—"নন্দা নন্দা—"

শঙ্কিতা চন্দ্রা দেয়ালের সুইচ টানিয়া দিল। উজ্জ্বল আলোয় সে দেখিল বিশ্বপতি ক্ষুদ্র বালকের মতই ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। চন্দ্রা একটা শান্তিপূর্ণ নিঃশ্বাস ফেলিল। অশ্রুধারা যখন গলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে তখন সান্ত্বনা মিলিবে আপনিই।

প্রভাতে বিছানা হইতে উঠিয়াই বিশ্বপতি বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

চন্দ্রা অতি কষ্টে চোখের জল সামলাইয়া তাহার যাত্রার আয়োজন করিয়া দিতেছিল। যে ছোট ট্রাঙ্কটা বিশ্বপতি লইয়া আসিয়াছিল, এতদিন সেটা আবদ্ধ অবস্থায় ঘরের এক পাশে পড়িয়া ছিল। বিশ্বপতি আর একটা দিনও এ ট্রাঙ্কটার খোঁজ লয় নাই, চন্দ্রাও ইহার মধ্যে কি আছে তাহা জানিবার জন্য উৎসুক হয় নাই। আজ বহু দিন পরে সেই বাক্সটা খুলিয়া সাজাইয়া দিবার জন্য নন্দার দেওয়া উপহার দ্রব্যগুলার পানে চোখ পড়িতে চন্দ্রা স্তম্ভিত হইয়া গেল।

এক-টুকরা কাগজে বড় বড় অক্ষরে লেখা "বউদিকে ভক্তি উপহার"। নীচে নাম লেখা—নন্দা।

চন্দ্রার চোখ ফাটিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া বাক্সের মধ্যে পড়িতে লাগিল। এ সব হইতে সে কোথায়—কতদূরে সরিয়া পড়িয়া আছে। এ সকলের নাগাল পাইবার ক্ষমতা তাহার নাই।

মনে পড়িল দেবতা দর্শনের অধিকার মাত্র তাহার ছিল। মন্দিরের বাহির হইতে সে দেবতা দেখিয়াছে, দরজার উপর উঠিতে কোন দিন সে যোগ্যতা পায় নাই। আজও হৃদয়ে অসীম শ্রদ্ধা প্রেম লইয়া

অর্ঘ্য সাজাইয়া সে মন্দিরের বাহিরেই থাকিয়া গেছে, ভিতরে প্রবেশ-লাভের অধিকার সে পায় নাই, কোন দিনই পাইবে না।

দুই হাতে আর্ত্ত বক্ষখানি চাপিয়া ধরিয়া সে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল, "দেহের দেউলে প্রদীপ জ্বলিল, কিন্তু তুমি তো জানিলে না দেবতা? জন্ম হইতে বঞ্চিতা রাখিয়াছ, দূর হইতে দেখার অধিকারই দিলে,—জীবন-ভোর তোমার আবাহন-গীতি গাহিয়া চলিলাম, তোমায় জাগাইতে পারিলাম না।"

যেমন গোপনে সে বাক্স খুলিয়াছিল তেমনই গোপনে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল।

বিদায়ের কালে সে যখন একতাড়া নোট বিশ্বপতির পকেটে দিল তখন বিশ্বপতি চমকিয়া পিছনে সরিয়া গেল,—"এ কি চন্দ্রা?"

প্রাণপণে উচ্ছ্বসিত কান্নাটাকে চাপিয়া চন্দ্রা বলিল, "নাও, অনেক দরকারে লাগবে। সৎ ভাবে জীবন কাটাতে গেলেও টাকার দরকার হয়, কেন না চুরি ডাকাতি করতে পারবে না, কোন দিন অদৃষ্টে ভিক্ষেও না জুটতে পারে। শুনেছি তোমার ঘর পড়ে গেছে, গিয়ে মাথা গুঁজবে এখন একটা আশ্রয় তো চাই।"

বিশ্বপতির চমক লাগিল—তাই বটে।

নোটের তাড়াটা বাহির করিয়া নাড়াচাড়া করিয়া বিশ্বপতি বলিল, "কত দিলে?"

চন্দ্রা বলিল, "বেশী নয়, পাঁচ হাজার।"

বিশ্বপতি যেন আকাশ হইতে পড়িল,—"পাঁচ হাজার! তুমি কি ক্ষেপেছ চন্দ্রা, তোমার যা কিছু সম্বল—যা কিছু জমিয়েছ সব আমায় দিয়ে দিলে? না না, ও সব পাগলামি রাখ, তোমার মাথা খারাপ হয়েছে বলে'

আমার মাথাও তো খারাপ হয় নি যে তোমার সর্ব্বস্ব আমি নিয়ে যাব। আমায় একশ' টাকা দাও, তাতে আমার ঢের চলবে। আমি বেকার অবস্থায় বসে থেকে আমার অতীত জীবনের পাপক্ষয় করবার জন্যে যে কেবল নাম জপ করব তা তো নয়, খেটে খাবই। জমী-জমা করব, তাতে এর পর বেশ আয় দাঁড়িয়ে যাবে যাতে আমার দিনগুলো রাজার হালেই কেটে যাবে।"

সে নোটের তাড়া তুলিতেই চন্দ্রা তাহার পায়ের কাছে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল, আর্ত্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না গো, এই আমার সর্ব্বস্ব নয়। আমার অনেক আছে—অনেক হবে। আমার মত অভাগিনী মেয়েরা না খেয়ে মরে না। মরলে জীবনে প্রায়শ্চিত্ত হল কই, বুকে আগুন জ্বললো কই? ও টাকা তুমি নিয়ে যাও। আমি যা দিয়েছি তা আর ফিরিয়ে নিতে পারব না।"

বিশ্বপতি কতক্ষণ নির্নিমেষে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া নোটের তাড়া পকেটে রাখিল।

চন্দ্রা প্রণাম করিল, বিশ্বপতি একটা কথাও বলিল না।

চন্দ্রা শুধু হাসিয়া বলিল, "পায়ের ধুলো নিলুম, একটা আশীর্ব্বাদও তো করলে না?"

উদাসভাবে বিশ্বপতি বলিল, "কি আশীর্ব্বাদ করব চন্দ্রা?"

চন্দ্রার চোখে জল আসিতেছিল। সে বলিল, "বল—শীগ্গির মরণ হোক। আর কোন দিকেই যাওয়ার পথ নেই, সব পথই কাঁটা ফেলে বন্ধ করেছি। কেবল ওই একটা পথই আমার খোলা আছে। বল—দু একদিনের মধ্যেই যেন মরণ হয়, আমি যেন সকল জ্বালা জুড়াতে পারি।"

বিশ্বপতি অকস্মাৎ যেন সচেতন হইয়া উঠিল, এবং আজ ভালো করিয়াই সামনের মানুষটীর পানে তাকাইল।

ইস, এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গিয়াছে চন্দ্রার! এ তো একদিনের পরিবর্ত্তন নয়! কত দিন ধরিয়া অল্পে অল্পে চন্দ্রার দেহ ক্ষয় হইয়া আসিতেছে, তাহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ মলিন হইয়া আসিয়াছে, বড় বড় দু'টি চোখের নীচে কালি পড়িয়া গেছে। সমস্ত মুখখানার উপরে যে ক্লান্তির ছায়া জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা তো বিশ্বপতি একদিনও দেখে নাই। নিজের খেয়ালেই সে চলিয়াছে। আর একটী মানুষ যে তাহার খেয়ালের জন্য নিজের সুখ-শান্তি, যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতেছে, তাহা সে জানিতেও চাহে নাই।

বিশ্বপতি চন্দ্রার মাথায় হাতখানা রাখিল। স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "না চন্দ্রা, সে আশীর্ব্বাদ আমি করব না, করতে পারব না। আশীর্ব্বাদ করছি তুমি সৎ হও, তোমার তুমিকে কল্যাণময় ভগবানের নামে সঁপে দাও, তাঁর কাজ কর।"

"পারব? আমি সৎ হতে পারব? আমার দ্বারা ভালো কাজ হতে পারবে?"

চন্দ্রা ব্যগ্রভাবে বিশ্বপতির হাতখানা দুই হাতে চাপিয়া ধরিল।

শুষ্ক হাসিয়া বিশ্বপতি বলিল, "পারবে না কেন চন্দ্রা? ভগবান তো সাধুর জন্যে নন, তিনি পাপীর জন্যেই রয়েছেন। মহাপাপী জগাই মাধাই পরিত্রাণ লাভ করেছিল, আমার মত মহাপাপীও পরিত্রাণ পাওয়ার আশা যখন করছে, তখন তুমিও পাবে না কেন চন্দ্রা? আমার চেয়ে মহাপাপ তো তুমি কর নি, তবু আমি যখন সৎপথে সৎ হয়ে চলবার আশা করছি, তুমিও সে আশা করতে পারো।"

চন্দ্রা বিশ্বপতির চরণে মাথা রাখিল, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তোমাকেই এই যাত্রাপথের গুরু বলে নিলুম। আজ আমায় যে নূতন ব্রতে ব্রতী করে গেলে, আশীর্ব্বাদ করে যাও—আমার সে ব্রত যেন সম্পূর্ণ করতে পারি।"

নিঃশব্দে সে চোখের জলে বিশ্বপতির পা ভিজাইয়া দিল।

"আসি চন্দ্রা, ট্রেণের সময় হয়ে এলো—"

চন্দ্রা উঠিল, অতি কষ্টে প্রবহমান চোখের জল সামলাইয়া বলিল, "এসো—"

কুলীর মাথায় সেই পুরাতন ট্রাঙ্কটী চাপাইয়া বিশ্বপতি বাড়ীর বাহির হইল।

পথে বাঁক ফিরিবার সময় সে একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল—খোলা দরজার উপর দাঁড়াইয়া চন্দ্রা,—অসহ্য কান্নার চাপে সে আর যেন দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছে না, তবু সে চাহিয়া আছে সেই পথটীর পানে—যে পথ বাহিয়া তাহার প্রিয় চিরকালের মতই চলিয়াছে। হয় তো আজ এই চিরবিদায়-ক্ষণে তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে সেই দিনটীর কথা—যেদিনে ওই পথেই সে আসিয়াছিল।

একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিশ্বপতি চোখ ফিরাইল।

সামনে পথ—ওই পথ বাহিয়া তাহাকে চলিতে হইবে, পিছনের দৃশ্য অদৃশ্য হইয়া যাক।

দীর্ঘ তিন বৎসর পরে বিশ্বপতি আবার গ্রামের বুকে পদার্পণ করিল।

গ্রামের যেন আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেছে,—সবই আছে অথচ যেন কিছুই নাই।

পথ দিয়া চলিতে বিশ্বপতি দুই দিক পানে চাহিতেছিল। দেখিতেছিল সে যাহা দেখিয়া গিয়াছিল সেগুলি ঠিক আছে কি না।

আষাঢ়ের আকাশ মেঘে ঢাকা। কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে বর্ষা নামিয়াছে, শুষ্ক খাল বিল পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, পথের ধারে ধারে জল জমিয়াছে। শুষ্কপ্রায় গাছগুলিতে নূতন পাতা ধরিয়াছে। খানিক আগে যে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গেছে তাহার জল এখনও টুপটাপ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। চারি দিক দিয়া জলধারা ছুটিয়া খাল বিল পুষ্করিণীতে পড়িয়া সেগুলিকে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। কালো আকাশের বুক চিরিয়া মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছে,—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গুরু গুরু মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছে।

দূরে সোঁ সোঁ করিতেছিল। কোথা হইতে ঝর ঝর করিয়া অজস্র বৃষ্টিধারা আসিয়া পড়িল চঞ্চল কলহাস্যপরায়ণ একদল শিশুর মতই। নিমেষে তাহারা আবার কোথায় বিলীন হইয়া গেল। পিছনে রাখিয়া গেল কেবল তাহাদের আসার চিহ্নটুকু।

ছাতা ছিল না,—সেই বৃষ্টিধারা বিশ্বপতির সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত করিয়া দিয়া গেল। দূর হইতে যখন বৃষ্টি আসিতেছিল, তখন বিশ্বপতি মুগ্ধ নয়নে

চাহিয়া দেখিতেছিল। যখন তাহাকে সিক্ত করিয়া দিয়া পিছনে ফেলিয়া সে ধারা আবার চলিয়া গেল, তখনও সে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া রহিল।

সুন্দর—অতি সুন্দর। খোলা মাঠে বৃষ্টির এই খেলা কি চমৎকার! জলধারার উন্মাদ নৃত্য নূপুরের ঝম ঝম শব্দ কাণে আনিয়া পাগল করে, ইহার শীতল স্পর্শে সকল জ্বালা যেন জুড়াইয়া যায়।

বাড়ীর কাছে আসিয়া বিশ্বপতি থামিল।

বর্ষাস্নাত জনবিরল পথ। এতখানি পথ আসিতে কাহারও সহিত দেখা হইল না। গ্রাম্য পথ যেন এই দিনের বেলাতেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বৃষ্টির নূপুর তাহার বুকে বুঝি সুরের তন্দ্রাজাল বুনিয়া দিতেছে। আকাশ মাদল বাজাইয়া সুরের তাল রাখিতেছে।

একখানি ঘর কোনক্রমে এখনও দাঁড়াইয়া আছে, আর দু'খানি পড়িয়া গেছে। যে ঘরখানি দাঁড়াইয়া আছে তাহার দরজা বন্ধ। "সনাতন—"

দীর্ঘ তিন বৎসর পরে নিজের বাড়ীর উঠানে দাঁড়াইয়া সে ডাকিল।

প্রকৃতির নিস্তব্ধতা টুটিয়া গেল। পাশেই একটী গাছের ডালে জল-সিক্ত দেহে একটী কাক বসিয়া ঝিমাইতেছিল, অকস্মাৎ শব্দে চমকিয়া সে তাকাইয়া দেখিল। বিশ্বপতি আবার ডাকিল—"সনাতন—"

পাশের বাড়ীর জানালা পথে বৃদ্ধা মুখুয্যে-গৃহিণীকে দেখা গেল।

"কে, বিশু,—ফিরে এসেছ বাবা? আমাদের বাড়ী এসো। ঘর তোমার চাবী বন্ধ, চাবী আমার কাছে রয়েছে।"

বিশ্বপতি জিজ্ঞাসা করিল, "সনাতন কি মেয়ের বাড়ী গেছে কাকিমা?"

কাকিমা উত্তর দিলেন, "আ আমার পোড়াকপাল রে,—সে খবরটাও পাও নি? সে কি আর আছে বাবা? আজ মাস তিনেক হল সে মারা গেছে। চাবি আর কারও কাছে দিয়ে গেল না—আমার হাতে দিয়ে

গেল। অসুখ শুনে ওর মেয়ে জামাই এসে নিয়ে যাওয়ার জন্মে সে কি টানাটানি! তবু কিছুতেই যদি সে গেল। স্পষ্ট বললে—"দা ঠাকুর আমায় বাড়ী চৌকি দিতে রেখে গেছে। বেঁচে থাকতে এ বাড়ী ছেড়ে আমার যাওয়া হবে না।" হলও ঠিক তাই, ওইখানে—তোমার ভিটেতেই সে মরল—তবু গেল না।" নন্দা—সনাতন,—

কোথায় তাহারা? তাহারা আজ ওই ঊর্দ্ধলোকে স্থান পাইয়াছে। ওখান হইতে তাহারা হতভাগ্য বিশ্বপতির পানে তাকাইয়া আছে কি? শ্রান্তদেহ বিশ্বপতি দাঁড়াইতে অক্ষম হইয়া বারাণ্ডায় বসিয়া পড়িল। সে দিনটা বাধ্য হইয়াই তাহাকে কাকিমার বাড়ীতে থাকিতে হইল। পরদিন সকাল হইতে সে নিজের গৃহসংস্কারের জন্ম লোকজন যোগাড় করিতে ব্যস্ত হইল। মিস্ত্রী নিযুক্ত হইল—নূতন ঘর তুলিতে হইবে। এই তাহার পিতৃ-পুরুষের ভিটা। এইখানেই তাহাকে থাকিতে হইবে। এখান হইতে সে আর কোথাও যাইবে না। হাতে যখন সে টাকা লইয়াছে—পিতৃ-পুরুষের ভিটা, নিজের জন্মভূমি সে ধ্বংস হইতে দিবে না। বর্ষার জন্ম ঘরের কাজ বড় বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিল না,—মাঝামাঝি স্থগিত হইয়া গেল।

পাড়ার পাঁচজন পরামর্শ দিলেন—এইবার বিয়ে-থাওয়া করে সংসারী হও বাছা,—আর এমন করে লক্ষ্মীছাড়ার মত টো টো করে বেড়িয়ো না।

বিশ্বপতি একটু হাসিল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলিল।

বর্ষা অতীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন ঘরের কাজ আবার আরম্ভ হইল। শীঘ্রই ঘর শেষ হইয়া গেল। একদিন বিশ্বপতি নূতন ঘরে প্রবেশ করিল।

এত দিন পরে সে চন্দ্রাকে একখানি পত্র দিল,—সে নূতন ঘর তুলিয়াছে, যদি চন্দ্রা এক দিন কিছুক্ষণের জন্যও এখানে আসে—যদি দেখিয়া যায়, বিশ্বপতি বড় আনন্দ পাইবে।

চন্দ্রা উত্তর দিল, তাহার গ্রামে ফিরিবার মুখ নাই। কলঙ্কিনী চন্দ্রার কলঙ্কময় পায়ের চিহ্ন পবিত্র গ্রামমাতার পথের ধূলায় আর অঙ্কিত হইবে না। বিশ্বপতি নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে শুনিয়া সে বড় আনন্দিত হইয়াছে। বিশ্বপতির সামনে সে আর যাইবে না। নিজেকে সে ভয় করে, প্রলোভনের বস্তু হইতে তাই সে তফাতে থাকিতে চায়। তাহার অবস্থা বুঝিয়া বিশ্বপতি যেন তাহাকে ক্ষমা করে, সে এই প্রার্থনা করিতেছে।

আজ কল্যাণীর কথা বিশ্বপতির মনে জাগিল না। জাগিল খুব বড় হইয়া এই যথার্থ দুর্ভাগিনী মেয়েটীর কথা, যে তাহাকে ভালোবাসিয়া কেবল তাহাকে বাঁচাইবার জন্যই জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া চিরদিনের জন্য দূরে চলিয়া গেছে,—তাহাকে নিজের সর্ব্বস্ব দিয়া পরম শান্তি লাভ করিয়াছে।

বিশ্বপতির মন আজ উঁচু সুরে বাঁধা। সে নিজেকে ফিরাইয়াছে। নন্দার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে লইয়া যে প্রতিজ্ঞা [illegible]রিয়াছিল তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহার মনে বিশ্বাস [illegible]ছে—জোর আছে—সে আর পদচ্যুত হইবে না।

চন্দ্রাকে সে আজ বড় করুণার চোখেই দেখে, চন্দ্রার জন্য সে বড় বেশী রকমই ভাবে। চন্দ্রা মুক্তি পাক, সৎ হোক, শান্তিলাভ করুক—আজ সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া সে ইহাই প্রার্থনা করে।

শরীরটা কয় দিন হইতে ভালো যাইতেছিল না। বিশ্বপতি দুই দিন কোথাও বাহির হয় নাই, ঘরেই শুইয়া পড়িয়া দিন কাটাইতেছিল।

আহারের ব্যবস্থা কাকিমার ওখানে ছিল। তিনি প্রত্যহ দু'তিনবার যাওয়া-আসা করিতেন, বিশ্বপতিকে দেখা-শোনা করিতেন।

আজকাল বিশ্বপতিকে দেখার লোকের অভাব ছিল না। তাহার অনেক টাকা হইয়াছে কথাটা খুব শীঘ্র গ্রামের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। নবীন মিত্র তাঁহার বয়স্থা কন্যাটীর উপযুক্ত পাত্ররূপে তাহাকেই নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন এবং বিশ্বপতির নিকটে এ প্রস্তাবও করিয়াছিলেন। কিন্তু সে হাঁ বা না কিছুই বলে নাই। নবীন মিত্রের আশা ছিল যথেষ্ট ; তিনি সেই জন্যই বিশ্বপতিকে সকলের বেশী যত্ন দেখাইতেছিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার পরে বিশ্বপতি একাই ঘরের মধ্যে শুইয়া পড়িয়া ছিল। খানিক আগে নবীন মিত্র চলিয়া গিয়াছেন। কাকিমাও একবার সাড়া দিয়া গিয়াছেন।

বাহিরে শুক্লা দশমীর চাঁদের আলো। চারি দিক অম্লান জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গেছে। দূরে কোথায় কোন্ নিভৃত নিকুঞ্জের অন্তরালে লুকাইয়া একটী পাপিয়া অবিশ্রান্ত চীৎকার করিতেছিল—চোখ গেল, চোখ গেল।

ঘরে লণ্ঠনটী খুব মৃদু ভাবে জ্বলিতেছিল। এক কোণে আড়ালভাবে থাকায় তাহার মৃদু আলো ঘরের মধ্যে স্ফুট হইয়া উঠিতে পারে নাই। বাহিরের স্ফুট জ্যোৎস্না মুক্ত জানালাপথে আসিয়া কতকটা বিছানার উপর কতকটা মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাতাস ঝির ঝির করিয়া

জানালা দিয়া আসিয়া দেয়ালে বিলম্বিত ছবির কাগজগুলাকে কাঁপাইয়া দিতেছিল।

বিশ্বপতি বিছানায় শুইয়া পড়িয়া বাহিরের পানে তাকাইয়া ছিল।

আজ রাত্রিটী কি সুন্দর। মনে পড়িতেছিল পুরীতে সমুদ্রতীরে এমনই জ্যোৎস্নালোকে নন্দার সঙ্গে বেড়ানোর কথা। সম্মুখে অনন্ত সমুদ্র। ঢেউয়ের উপর চাঁদের আলো পড়িয়া কি সুন্দর লুকোচুরি খেলা করিতেছিল। পায়ের তলায় বালুকারাশি ঝিকমিক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। আজ যেমন জ্যোৎস্নাদীপ্ত নীলাকাশের বুকে কোথা হইতে টুকরা টুকরা সাদা মেঘ ভাসিয়া আসিয়া দৃপ্ত চাঁদের উপর দিয়া আবার কোন্ অজানা দেশে চলিয়া যাইতেছে—সেদিনও তেমনই চলিতেছিল।

নন্দার সে কি আনন্দ! তাহার মুখের কথা সেদিন ফুরায় নাই। কলকণ্ঠ বিহগীর ন্যায় সে কেবল সেদিন গল্প করিয়াছিল। বিশ্বপতি চলিতে চলিতে কতবার সেঁ জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল হাসিভরা মুখখানার পানে তাকাইয়া ছিল। কতবার তাহার মনে হইয়াছিল, আকাশের চাঁদ সুন্দর, না এই মুখখানি সুন্দর। তুলনায় যেন নন্দার মুখখানাই অধিকতর সুন্দর বলিয়া মনে হইয়াছিল।

একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস বিশ্বপতির সমস্ত বুকখানা দলিয়া দিয়া গেল। হায় রে, সে আজ কোথায়? সে ওই চাঁদের রাজ্যেই চলিয়া গেছে। বিশ্বপতির ব্যগ্র দুইটী বাহুর বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেছে। ব্যগ্র বুকের আকুল আহ্বানে দেখা দেওয়া দূরে থাক, একটী সাড়াও দিবে না।

কিন্তু বিশ্বপতি শুনিয়াছে অন্তরের একাগ্রতাময় আহ্বান না কি অনন্তের অধিবাসীকেও চঞ্চল করিয়া তুলে,—তাহাকে ইহলোকে টানিয়া আনে। আজ সে অনন্তকে বিশ্বাস করিতে চায়। মরিলেই সব ফুরায়

বলিয়া ধারণা করিতে তাহার বুক ফাটিয়া যায়। নন্দা অনন্তে আছে, তাহার সব শেষ হইয়া যায় নাই—হইতে পারে না। আজ সে প্রাণপণে বড় ব্যগ্রতায় নন্দাকে ডাকে, নন্দা কি একবার আসিয়া তাহাকে দেখা দিয়া যাইতে পারিবে না ?

নন্দা, নন্দা, কোথায় নন্দা—কোথায় তুমি ? একটীবার মুহূর্ত্তের জন্যও কি আসিতে পারিবে না ? একটীবার চোখের দেখা দিয়া যাইতে পারিবে না ? ওগো অনন্তবাসিনি, একটীবার মুহূর্ত্তের জন্যও এসো, দেখা দাও।

বিশ্বপতি চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

দূরে কোথায় বাঁশী বাজিতেছিল। জ্যোৎস্না রাত্রে সে বাঁশীর সুর বড় সুন্দর শুনাইতেছিল।

বারাণ্ডায় একটা শব্দ শুনিয়া সে চাহিল,—বোধ হয় মিত্র মহাশয় আসিয়াছেন।

কিছুক্ষণ অতীত হইয়া গেল, কেহ আসিল না।

দরজার কাছ হইতে কে যেন সরিয়া গেল, ক্ষীণ আলোকে যেন তাহার শাড়ীর লাল পাড়টুকু দেখা গেল। কে যেন দরজার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল,—বিশ্বপতি এ পাশে ফিরিতেই সে পাশে লুকাইল।

"কে, কে ওখানে—"

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

নন্দা আসিয়াছে কি ? হাঁ, নিশ্চয়ই সে আসিয়াছে। সে ছাড়া আর কেহ নহে। বিশ্বপতিকে সে বড় ভালোবাসিত। বিশ্বপতির আহ্বানে সে তাহার বড় প্রিয় চন্দ্রলোকে পর্য্যন্ত থাকিতে পারে নাই। সে বিশ্বপতির কাছে আসিয়াছে।

"নন্দা, নন্দা—"

বিশ্বপতি ডাকিতে লাগিল—"এদিকে এসো, সামনে এসো নন্দা। এসেছ যদি—নিষ্ঠুরার মত চলে যেয়ো না।"

ধীরপদে একটী নারীমূর্ত্তি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। মৃদু আলোকে স্পষ্ট দেখা গেল না, মনে হইল তাহার মুখের অর্দ্ধেকটা অবগুণ্ঠনে আবৃত।

"নন্দা—"

বিশ্বপতি একেবারে উঠিয়া বসিল।

"আমি নন্দা নই। নন্দা নেই, সে মরে গেছে। মরা মানুষ জীবন্তের রাজত্বে আসতে পারে না।"

এ কি, এ কাহার কণ্ঠস্বর? বিশ্বপতি বিস্ফারিত নেত্রে রমণীর পানে তাকাইয়া রহিল। অস্ফুটে তাহার কণ্ঠ হইতে অজ্ঞাতেই বাহির হইল,—"চন্দ্রা—"

মেয়েটী হঠাৎ তাহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া, তাহার পায়ের উপর একেবারে উপুড় হইয়া পড়িল। আর্ত্ত কণ্ঠে কাঁদিয়া বলিল, "না গো, বাগ্দীর মেয়ে চন্দ্রাও যে সৌভাগ্য লাভ করেছে, আমি তাও পাই নি। আমি নন্দা নই, চন্দ্রাও নই, আমি অভাগিনী কল্যাণী"—

"কল্যাণী—"

সামনে কালসাপ দেখিয়াও মানুষ বোধ হয় এত চমকাইয়া উঠিত না। বিশ্বপতি পা সরাইয়া লইতে গেল, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িতে গেল, কল্যাণী পা ছাড়িল না। দুই হাতে পা দু'খানি চাপিয়া ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বিশ্বপতি যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না—কল্যাণী ফিরিয়া আসিয়াছে! সেই কল্যাণী—যাহাকে সে একদিন এক মুহূর্ত্তের জন্য

দেখিয়া বুঝিয়াছিল কল্যাণী কোথায় গিয়াছে, সুখসমৃদ্ধির চরম সীমায় সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সেই কল্যাণী, যাহার নাগাল পাওয়া তাহার মত লোকের পক্ষে কল্পনারও অতীত! সে আজ আবার এখানে, এই পল্লীতে—এই কুটীরে ফিরিয়াছে?

উভয়েই নীরব। কল্যাণী কেবল কাঁদিতেছিল। আর বিশ্বপতি ভাবিতেছিল দূর অতীতের ও বর্ত্তমানের কথা।

তবুও তো সে সংসার পাতাইয়াছিল। হয় তো কল্যাণীকে লইয়া সে সুখী হইতে পারিত। বাল্য প্রেমের কথা ভবিষ্যতে কোন দিন না কোন দিন তাহার মন হইতে মিলাইয়া যাইত। তাহা হয় নাই। দারুণ ঈর্ষায় কল্যাণীর হৃদয় দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল,—সে নন্দার প্রতি স্বামীর আকর্ষণ সহিতে পারে নাই।

কেই বা পারে? বড় ভালোবাসার পাত্র বা পাত্রীকে অপরের হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে কে পারে? নারী আত্মহত্যা করে, সুখের সংসারে আগুন ধরাইয়া দেয়, নিজেকে ধ্বংসের পথে অগ্রসর করিয়া দেয়,—ইহার মূলে অনেক সময় এই একটী কারণই থাকে না কি? সরল প্রকৃতি পুরুষ অনেক আঘাত সহিতে পারে, অনেক ক্ষতি সহিতে পারে; দুর্ব্বলা নারী কোনও আঘাত, কোনও ক্ষতি সহিতে পারে না।

বিশ্বপতি বাহিরের পানে তাকাইয়া রহিল। তখনও বাহিরে অম্লান চাঁদের আলো, তখনও পাপিয়া দূরে কোথায় ডাকিতেছে—চোখ গেল, চোখ গেল।

চাহিয়া চাহিয়া চোখ জ্বালা করিতে লাগিল; বিশ্বপতি চোখ ফিরাইয়া পদতলে নিপতিতা নারীর পানে তাকাইল।

অনুতাপ? বোধ হয় তাহাই ঐশ্বর্য্য। তাহার অনুপমেয় অসীম

সৌন্দর্য্যে ইহাকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে নাই। দরিদ্রের এই পর্ণকুটীরই তাহাকে শত বাহু মেলিয়া ডাকিয়াছে। সে দূরে থাকিতে পারে নাই,—সহস্র বন্ধন দুইটী কোমল হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে ঘরের পানে ছুটিয়া আসিয়াছে।

সে আশ্রয় চায়। এই ঘরে তাহার পূর্ব্ব-স্মৃতি লক্ষ শিকড় ছড়াইয়া জাঁকিয়া বসিয়াছে। সে এখন এই স্থানে তাহার জায়গা গড়িয়া লইতে আসিয়াছে। কিন্তু তাহা কি আর সম্ভব হয়? কল্যাণী ভাবিয়াছে, সেই শিকড় দিয়া সে আবার বাঁচিবার সম্বল আহার্য্য যোগাড় করিয়া লইবে। কিন্তু তাই কি হয়? বাহিরের আকর্ষণে সে যখন ঝুঁকিয়াছিল, তখন সেই সূতার মত লক্ষ বাঁধন যে ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সেদিক কি সে দেখে নাই?

বিশ্বপতি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল।

"কল্যাণী,—রাঙাবউ—"

কল্যাণী,—চমকাইয়া উঠিয়া মুখ তুলিল। সেই "রাঙাবউ" আহ্বান। বহু কাল সে এ ডাক শুনিতে পায় নাই। । অনেক আদরের সম্ভাষণ হয় তো সে শুনিয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল কি?

একবার মাত্র মুখ তুলিয়াই সে আবার বিশ্বপতির পায়ের উপর মুখখানা রাখিল।

সুদীর্ঘ নিঃশ্বাসটাকে অতি কষ্টে প্রশমিত করিয়া ফেলিয়া বিশ্বপতি বলিল, "কিসের আকর্ষণে আজ রাজপ্রাসাদ ছেড়ে এই দীন দরিদ্রের পর্ণকুটীরে এলে রাঙাবউ? এখানে এমন কিছুই নেই যা তোমায় এতটুকু তৃপ্তি শান্তি দিতে পারবে!"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কল্যাণী বলিল, "ভুল বুঝেছ গো, আমার তুমি ভুল বুঝেছ। আমি আমার অন্তরের ডাকে এসেছি। এই ঘরের আকর্ষণ আমি কিছুতেই ঠেকাতে পারলুম না। এই গাঁয়ের পথ আমায় ডেকেছে, এর ঘাট আমায় ডেকেছে, এর আকাশ, বাতাস, গাছ, লতা আমায় ডেকেছে। এর ডাক এড়িয়ে আমি কোথায়—কেমন করে থাকব গো, আমি কোথায় থেকে শান্তি পাব?"

গম্ভীরভাবে বিশ্বপতি বলিল, "যারা ডেকেছে তাদের কাছে যাও কল্যাণী। আমি তো তোমায় ডাকি নি। তবে আমার কাছে এসেছ কেন?"

"না, তুমি আমায় ডাক নি। না ডাকতে এসেছি, এ অপরাধের

শাস্তি দাও। তোমার দেওয়া দণ্ড যতই কঠোর হোক—আমি তা মাথা পেতে নেব। আমায় দণ্ড দাও গো, আমি সেই দণ্ড নিতেই এসেছি।"

সে বিশ্বপতির পায়ের কাছে মাথা খুঁড়িতে লাগিল।

ব্যস্ত হইয়া বিশ্বপতি তাহাকে ধরিবার জন্য হাতখানা বাড়াইয়াই সরাইয়া লইল,—"আঃ, ও কি করছ কল্যাণী? ওঠ—ছিঃ, ও রকম পাগলামী করো না।"

কল্যাণী মাথা তুলিল।

তাহার মুখ তখন বিষাদ-মলিন, গম্ভীর। বলিল, "আমায় জিজ্ঞাসা করছ কেন এলুম? কেন এলুম সে কথা বললে বিশ্বাস করবে কি?"

বিশ্বপতি বলিল, "আমায় কোন কথা বিশ্বাস করানোর জন্যে তোমার এত ব্যাকুলতা কেন কল্যাণী? আমি অতি ক্ষুদ্র, আমার ওপরে নির্ভর করাই যে তোমার অনুচিত।"

কল্যাণীর মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, "আমি কোথাও থাকতে পারি নি, তাই এখানে চলে এসেছি।"

"কিন্তু যে দিন চলে গিয়েছিলে সে দিনে কি ভেবেছিলে কল্যাণী—পেছনে যাকে ফেলে চলেছো, সে তোমাকে অবিরত ডাক দেবে, সেই ডাক তোমায় কোথাও স্থির হয়ে থাকতে দেবে না?"

বিশ্বপতি হাত বাড়াইয়া লণ্ঠনের দম বেশী করিয়া দিয়া ভালো করিয়া কল্যাণীর পানে তাকাইল।

কল্যাণী মুখ নত করিয়া বসিয়া রহিল। একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

উভয়ে অনেকক্ষণ নীরব।

বিশ্বপতি ঘরের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল। বলিল, "আর রাত করছ কেন—এখন যাও।"

কল্যাণী মুখ তুলিয়া তাহার পানে চাহিল। সে চোখে সর্ব্বহারার দৃষ্টি ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেন তাহার যাহা কিছু ছিল সব সে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

ধীর কণ্ঠে সে বলিল, "আমায় তাড়িয়ে দিচ্ছ; কিন্তু আমি যাব বলে তো আসি নি, তোমার পায়ের কাছে থাকব বলে এসেছি। ভয় নেই, আমার দ্বারা তোমার এতটুকু অনিষ্ট হবে না। আমি তোমার কাছ হতে অনেক দূরে সরে থাকব। আমায় কেবল এই ঘরে থাকবার অনুমতি দাও।"

বিশ্বপতি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িল, একটী কথাও বলিল না।

কল্যাণী কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আমায় এতটুকু অধিকারও দেবে না, কিন্তু চন্দ্রাকে তো অনেকখানিই অধিকার দিয়েছিলে? ঘৃণ্য বাগ্দীর মেয়ে হয়েও সে যা পেলে, আমি তা পাব না,—তার এতটুকু পাওয়ার দাবী করতে পারব না?"

শক্ত ভাবেই বিশ্বপতি বলিল, "ভুল করেছ কল্যাণী। চন্দ্রা গৃহত্যাগ করে গেলেও তার স্থান ছিল ঘরে—কেন না আমার জন্যেই সে গিয়েছিল। কিন্তু তুমি তো আমার জন্যে—আমায় বাঁচাতে যাও নি কল্যাণী,—আমায় সব রকমে ধ্বংস করতে তুমি চলে গেছলে। কিন্তু কি চমৎকার অভিনয় করতেই শিখেছ, আমি তাই ভাবি। তোমার মত "ষ্টেজ ফ্রি" হতে খুব কম অভিনেত্রীই পারে। সেই জন্যেই তোমার নাম চিত্রজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। চন্দ্রা গ্রাম ত্যাগ করে গেছে, আর সে এখানে

আসে নি। আমার জন্যে সে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছে, তবু সে আমার শত সহস্র অনুনয়েও এখানে এল না। আর তুমি—তুমি কল্যাণী,—যে মুখে নিজের হাতে চুণ কালি মেখেছ, সেই মুখ দেখাতে গ্রামে ফিরে এসেছ,—তবু আবার থাকতে চাচ্ছো কি করে? মনে রেখো—এখানে তোমার এই অভিনয়ে লক্ষ হাতে করতালি পড়বে না, অগস্তি প্রাণের অর্ঘ্য তোমার পায়ের তলায় জমবে না।"

কল্যাণী বদ্ধদৃষ্টিতে বিশ্বপতির কঠিন মুখখানার পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার চোখে এতটুকু জল ছিল না। কিন্তু তাহার আরক্তিম ঠোঁট দু'খানা নীল হইয়া গিয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল।

হঠাৎ সে উঠিয়া পড়িল। দরজার দিকে দুই পা অগ্রসর হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বপতির পাশে বসিয়া পড়িল। দুই হাতের মধ্যে মুখখানা ঢাকিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "নিষ্ঠুর, পাষাণ, আমি যে কেবল তোমার জন্যেই সব ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছি, কেবল তোমার জন্যেই এই গ্রামে আবার পা দিয়েছি। তোমার সেবা যদি করতে পাই—লোকে যে যাই বলুক—কারও কথা কাণে নেব না বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছি। সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢেকে লুকিয়ে এসেছি, কাউকে দেখতে দিই নি। ওগো, আমায় এমন করে নিষ্ঠুরের মত তাড়িয়ে দিয়ো না। আমায় এখানে—তোমার ঘরে এতটুকু আশ্রয় দাও। আমি কেবল তোমার কাজ করে দেব, তোমায় চাইব না।"

বিশ্বপতি মাথা নাড়িল, দৃঢ়কণ্ঠেই বলিল, "আর তা হয় না কল্যাণী, আর তা হবে না। সামনে জ্বলন্ত আগুন নিয়ে আমি বাস করতে পারব না। আমার বুকে দিনরাত আগুন জ্বলছে, আরও জ্বলবে। শেষে আমায় আত্মহত্যা করে সকল জ্বালার অবসান করতে হবে।

বুঝলে কল্যাণী, তুমি যেমন আমায় মিথ্যে সন্দেহ করে নিজেকে নষ্ট করেছ, আমি তোমার ওপরে সত্যিকার অভিমান নিয়েই নিজেকে ধ্বংস করেছিলুম। অনেক কষ্টে আবার মানুষ হওয়ার চেষ্টা করছি। এ সময় আমায় বাধা দিয়ো না। অনেক মহাপাপ করেছি। অনুতাপ করবার অবকাশ যাতে জীবনকালের মধ্যে পাই—তাই কর। আমায় আর আত্মহত্যারূপ মহাপাতকে ডুবিয়ো না।"

কল্যাণী থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ চেষ্টা করিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া সে বলিল, "ভাই ভালো, আমি চলে যাব,—তোমাকে আর পাপে ডুবাব না। কিন্তু আজ এই রাত্রে আমায় এতটুকু আশ্রয় দেবে না কি? একা এই রাত্রে কোথায় যাব? কেউ আমায় আশ্রয় দেবে না। অন্ততঃপক্ষে আজকের রাতটা,—আমি কাল ভোর হতেই উঠে চলে যাব—"

ধড়মড় করিয়া বিছানা হইতে উঠিয়া শশব্যস্ত ভাবে বিশ্বপতি বলিল, "আমার তাতে এতটুকু আপত্তি নেই। আজ রাত্রে তুমি এখানে এই ঘরেই থাকো, আমি বাইরে যাচ্ছি।"

"কিন্তু তোমার যে অসুখ—"

শুষ্ক হাসিয়া বিশ্বপতি বলিল, "এমন কিছু শক্ত ব্যায়ারাম নয়, সামান্য জ্বর মাত্র—ওতে কিছু হবে না। আমি বারাণ্ডায় একটা মাদুর পেতে শুয়ে রাতটা কাটিয়ে দেব এখন, তুমি ঘরে থাকো।"

কল্যাণী আড়ষ্ট ভাবে বসিয়া রহিল। বিশ্বপতি একটা মাদুর ও একটা বালিস লইয়া গিয়া বারাণ্ডায় রাখিয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল কল্যাণী তখনও সেইভাবে বসিয়া আছে।

বিশ্বপতি শান্তভাবে বলিল, "আজ বোধ হয় বিশেষ কিছু খাওয়া

হয় নি। ওই আলমারীতে দুধ আছে, ঘরে আর কিছুই নেই। উপোস করে থেকো না, দুধটুকু খেয়ে কুঁজোয় জল আছে নিয়ো। আমি এই বারাণ্ডায় রইলুম। ভয়ের কোন কারণ নেই। তুমি দরজা বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হয়ে শোও।”

সে বারাণ্ডায় চলিয়া গেল।

বাহিরে মাদুর পাতার শব্দ হইল, বিশ্বপতি যে শুইয়া পড়িল তাহাও বেশ বুঝা গেল।

কল্যাণী উঠিল না, নড়িল না, একটী দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলিতে পারিল না। তাহার বুকের মধ্যে ব্যথার বোঝা জমাট হইয়া বসিয়াছিল, সে তাহা এতটুকু হাল্কা করিবার চেষ্টাও করিল না, অথবা উপায় খুঁজিয়া পাইল না।

বাহিরে দশমীর চাঁদ তখন ডুবিয়া গেছে, অন্ধকার ঝোপে গর্ত্তে কোথায় লুকাইয়া ছিল, চাঁদ ডুবিবার সঙ্গে সঙ্গে রক্ত-পিপাসু ব্যাঘ্রের মতই নিরীহ ধরিত্রীর বুকে লাফাইয়া পড়িল।

গান গাহিতে গাহিতে পাখাটী থামিয়া গেছে। অন্ধকার নামিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখেও বুঝি বিশ্বের ঘুম জড়াইয়া আসিয়াছে। নীড়ের মাঝেই বুঝি সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নিকটে নারিকেল গাছের একটা পাতার গোড়ার দিকে একটা পেচক আসিয়া বসিল ও বারকতক ডানা নাড়িল। নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সেই একটা তাহার অভিযোগ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিতে লাগিল। আকাশের গায়ে অগণন তারা ফুটিয়া উঠিয়া অন্ধকার ধরিত্রীর পানে নিস্তব্ধে তাকাইয়া ছিল। পেচকের অভিযোগ কেবল তাহাদেরই কাছে পৌছিতেছিল।

মধ্য রাত্রিতে অকস্মাৎ বিশ্বপতির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মনে হইল—

ঘরের মধ্যে কল্যাণী যেন মুখে চাপা দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে! সে তাহার অভিযোগ শুনাইতে চায় কাহাকে? অন্ধকার ঘরে সে কাহার পায়ে প্রাণের গভীর বেদনা উজাড় করিয়া ঢালিতে চায়?

রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া বিশ্বপতি ডাকিল, "কল্যাণী—রাঙাবউ—"

হয় তো তাহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা তখন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। দরজা খোলা থাকিলে হয় তো সে ভূলুণ্ঠিতা কল্যাণীর মাথাটা নিজের কোলেই টানিয়া লইত।

ভিতর হইতে কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। বোধ হয় গভীর ঘুমের মধ্যে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে কাঁদিয়াছিল। বিশ্বপতির সাড়া পাইয়া দুঃপ্ন তাহার বিভীষিকা লইয়া সরিয়া গিয়াছে।

আপনা আপনিই কুণ্ঠিত হইয়া বিশ্বপতি নিজের মাদুরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

ভোরের আলো ধরার গায়ে প্রথম চুম্বনরেখা আঁকিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বপতি ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

কাল রাত্রে কত কি ঘটিয়া গেছে,—আজ ভোরের আলোয় মনে হইতেছে সে সব যেন একটা স্বপ্ন। কিন্তু সে স্বপ্ন নয়, এই প্রভাতের আলোর মতই সত্য। কল্যাণী আসিয়াছে,—কাল রাত্রে সে এই ঘরে বাস করিয়াছে,—এখনও ঘরের ভিতর রহিয়াছে। হয় তো এখনও ঘুমাইয়া আছে, দরজা এখনও ভিতর হইতে বন্ধ।

সূর্য্য উঠিয়া পড়িল। সমস্ত বারাণ্ডা, উঠান রৌদ্রে ভরিয়া গেল। একজন দুইজন করিয়া কয়েকজন প্রতিবাসীও আসিয়া পড়িলেন।

বিশ্বপতির শারীরিক খবর লইতে তাঁহারা সকলেই উৎসুক। সে ভালো আছে। তাঁহারা যে এত ভোরেই তাহাকে দেখিতে আসিয়াছেন, সেজন্য সে তাঁহাদের নিজের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইল।

মিত্র মহাশয় সবিস্ময়ে বলিলেন, "বাবাজি কাল সারারাত কি এই বারাণ্ডাতেই শুয়েছিলে না কি? ঘর তো দেখছি বন্ধ, এখানে বিছানা পাতা দেখছি—"

বিশ্বপতি উত্তর দিল না।

ততক্ষণে আর দু'একজনে কথাবার্ত্তা চলিয়াছে। কাল সন্ধ্যার ট্রেণে একটী মেয়ে ষ্টেশনে নামিয়াছে। একাই সে অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া গ্রামের পথে চলিতেছিল। সে মেয়েটী কে, কোথায় গেল, ইহাই লইয়া তাঁহারা বিলক্ষণ মাথা ঘামাইতেছিলেন।

বিশ্বপতির মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল।

তাঁহারা খানিক পরে যখন বিদায় লইলেন, তখন সে যেন নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া সে ডাকিতে লাগিল, "কল্যাণী, কল্যাণী—রাঙাবউ—"

উত্তর নাই।

ঘরে যেন মানুষ নাই,—ঘর এমনই নিস্তব্ধ। রাত্রে তবু একটু উসখুস শব্দও পাওয়া গিয়াছিল,—আজ এতটুকু শব্দ নাই।

ব্যস্ত হইয়া বিশ্বপতি ডাকিতে লাগিল—"রাঙাবউ, ওঠো—, দরজা খোল—"

তথাপি উত্তর নাই।

কি একটা অমঙ্গল আশঙ্কায় বিশ্বপতির সারা হৃদয়খানা পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে দরজা ছাড়িয়া জানালার কাছে গিয়া দেখিল কল্যাণী জানালাটিও বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

আশঙ্কা যেন সত্যেই পরিণত হইয়া যায়। রুদ্ধশ্বাসে জানালার এতটুকু একটী ফাঁক দিয়া বিশ্বপতি ঘরের ভিতরটা দেখিবার চেষ্টা করিল।

মেঝের উপর কল্যাণী শুইয়া আছে। বিশ্বপতির শত ডাকেও সে নড়িল না।

শঙ্কিত বিশ্বপতি দুই একজন নিম্নশ্রেণীর লোককে ডাকিয়া অবশেষে দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল।

কল্যাণী তখনও শুইয়া। বিশ্বপতি মাথার কাছে জানালাটা খুলিয়া দিতেই এক ঝলক রৌদ্র আসিয়া কল্যাণীর মুখখানার উপর পড়িল।

শান্ত স্থির মুখ, সে যেন ঘুমাইয়া আছে। বিশ্বপতি তাহার কপালে হাত দিল, বুকে হাত দিল, সে দেহ বরফের মতই শীতল। নাসিকায়

হাত দিয়া সে পরীক্ষা করিল তাহার নিশ্বাস পড়িতেছে কি না। সকল পরীক্ষা শেষ করিয়া সে কল্যাণীর মাথার কাছে বসিয়া পড়িল।

দরজার নিকট হইতে কালুমিস্ত্রি সোদ্বেগে জিজ্ঞাসা করিল, "মা লক্ষ্মী না, দা-ঠাকুর?"

বিশ্বপতি একবার শুধু তাহার পানে তাকাইল। একটী শব্দ তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না। দেখিতে দেখিতে সমস্ত গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল, বিশ্বপতির কুলত্যাগিনী পত্নী কাল রাত্রে ফিরিয়া আসিয়া এখানেই আত্মহত্যা করিয়াছে। ছোট বড় স্ত্রী পুরুষ যে যেখানে ছিল, সকলেই ব্যাপারটা দেখিতে ছুটিয়া আসিল।

বিশ্বপতি কোন দিকে চাহিল না, একদৃষ্টে কেবল কল্যাণীর মুখের পানেই তাকাইয়া রহিল।

অভাগিনী, সত্যই বড় অভাগিনী। স্বামীর উপর নিদারুণ অভিমান বশে, কেবল স্বামীকে জব্দ করিবার জন্যই সে গৃহত্যাগ করিয়াছিল। কিন্তু জব্দ করিতে গিয়া জব্দ হইল সে নিজেই; নিজের শান্তি সুখ সে নিজেই নষ্ট করিয়াছে। সে রাণীর ঐশ্বর্য্য, সম্মান পাইয়াছিল। প্রভূত ক্ষমতাও তাহার করতলে ছিল। তবু এই কুটীরের মায়া, স্বামীর প্রেম, গ্রামের ডাক সে ভুলিতে পারে নাই; তাই সে ঐশ্বর্য্য, সম্মান, ক্ষমতা সব ফেলিয়া দীন বেশে আবার স্বামীর কাছে এই কুটীরেই ফিরিয়াছে। এই কুটীরেই সে তাহার শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়া গেল। এইখানে তাহার অন্তরে যে প্রেম প্রথম বিকশিত হইয়াছিল, সে প্রেমের সমাধি সে এইখানে এইরূপে দিয়া গেল।

মুখের উপর তাহার কি শান্তি, কি তৃপ্তিই না ফুটিয়া উঠিয়াছে। যদিও সে তাহার প্রিয়তমের স্পর্শ পায় নাই, তবু সান্নিধ্য

পাইয়াছে। সেই যে তাহার মত কুলত্যাগিনী কলঙ্কিনীর পক্ষে যথেষ্ট পাওয়া।

একটী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বিশ্বপতি মুখ ফিরাইল।

কি নিদারুণ অভিশপ্ত জীবন তাহার। সে কিছুই পাইল না। যাহারা তাহাকে ভালোবাসিয়াছিল তাহারা সবাই তাহার স্মৃতির জালে জড়িত হইয়াই রহিল। কল্পনায় তাহাদের দেখা মিলিবে, সম্পত্তি মিলিবে, বাস্তবে তাহারা চিরদিনের জন্যই বিলীন হইয়া গেল।

ঠিক মাথার কাছেই একখানা পত্র পড়িয়াছিল,—কল্যাণীর হাতের লেখা। কাল অনেক রাত্রি অবধি ঘরে আলো জ্বলিয়াছিল। সে বোধ হয় বিশ্বপতির কাগজে তাহারই পেন্সিল দিয়া তাহাকেই পত্রখানা লিখিয়া গিয়াছে।

কল্যাণী লিখিয়াছে—

আমায় তুমি ঘরছাড়া করতে চাও নিষ্ঠুর? একবার নিদারুণ অভিমানের বশে রাগে দুঃখে কেবল তোমায় জব্দ করবার জন্যেই স্বেচ্ছায় ঘর ছেড়ে চলে গিয়েছিলুম। আজ যখন ভুল বুঝে ফিরেছি, তখন আর কি ফিরতে পারি,—তাই কি সম্ভব? আমি এসেছি—কোথাও যাব না। এখানে আমার জায়গা, আমি এখানেই থাকব। এইখানে যে শেষ শয্যা বিছাব, তুমি যখনি ঘরে আসবে তোমার মনে সেই স্মৃতিটাই দপ করে জ্বলে উঠবে। আমায় মন হতে তাড়িয়েছ, ঘর হতে তাড়াতে চাও,—পারবে না। আমি জোর করে দখল করব।

আমি মরব,—হ্যাঁ, কেউই আমায় রক্ষা করতে পারবে না। এই মাত্র তুমি আমার রুদ্ধ দরজায় ঘা দিয়ে ডাকলে কল্যাণী, রাঙাবউ। মন অধীর হয়ে উঠল সে ডাকে। মনে হল—দরজা খুলে দিয়ে তোমার

প্রসারিত দু'টি হাতের বাঁধনে নিজেকে ধরা দেই। কিন্তু না, আজ রাত্রে তুমি হয় তো সাময়িক উত্তেজনায় আমায় তোমার পাশে টেনে নেবে। রাত প্রভাতের সঙ্গে মিলবে কি—কেবল ঘৃণা আর অবজ্ঞা নয় কি ?

তোমায় আমি হেয় করব না। তুমি যেখানে উঠেছ, আমি সেইখানেই তোমায় রাখব। তুমি জানো—তোমার জন্যে একদিন নিজেকে ধ্বংস করেছি,—আজ প্রাণটাকেও নষ্ট করব।

আজ আমার কি মনে পড়ছে জানো ? এই ঘরে প্রথম যে দিন নূতন বউ হয়ে এসে ঢুকলুম, সেই দিনটীর কথা। ফুলশয্যা এই ঘরেই হয়েছিল সে কথা মনে পড়ে কি ? হয় তো তোমার মনে নেই, কিন্তু আমার মনে আছে। কেন না, সে দিনের স্মৃতি তুমি আজ ভুলে যেতে পারলেই বাঁচো, কারণ, সে দিনটাকে তুমি সেদিন প্রাণপণে এড়াতে চেয়েছিলে। আমি তা চাই নি; আমি চেয়েছিলুম সেই রাতটীকে সম্পূর্ণভাবে সার্থক করে নিতে, যার স্মৃতি চিরকালই আমার স্মৃতি-মন্দিরে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলবে।

তার পর কত জ্যোৎস্নাসিক্ত রাত এসেছে। কত ফুলই কত দিন পেয়েছি। কত রাতে কত পাপিয়া কত কোকিল গান গেয়েছে। কিন্তু সে রাতটী আর পেলুম না। অনেক মুক্তা জহরত জীবনে পরতে পেয়েছিলুম, কিন্তু সেদিনে নিজের অনিচ্ছায় কেবল মায়ের আজ্ঞা পালন করতে যে লোহাটী তুমি নিজের হাতে আমায় পরিয়ে দিয়েছিলে তার মূল্য নেই। সে অমূল্য সম্পদ আজও আমি বড় যত্নে হাতে রেখেছি।

ওগো, এ ভুল তো করতুম না—যদি তখন একটীবার আমায় ডাকতে—একটীবার বলতে—"তুমি বেশ করেছ, আমার অসুখের খবর পেয়ে এত দূরে—পুরীতে ছুটে এসেছ।" তুমি আমায় রূঢ় কথা বললে।

আমার অন্ধ অভিমান তাই আমায় নিয়ে এল সেইখানে—যেখানে আছে কেবল নিকষ কালো ঘন অন্ধকার। সেখানে, ওগো দেবতা—তুমি নেই, আছে কেবল শয়তান। আরাধ্য দেবতা, তিরস্কার করছ—কর, কিন্তু আমার ওই ঘর যে আমায় ডাক দিয়েছে,—আমায় গ্রামের পথ ঘাট যে আমায় ডাক দিয়েছে,—আমি দূরে সরে থাকব কি করে?

আজ প্রাণ ভরে ওদের দেখে নিচ্ছি। জানালা দিয়ে দেখছি ঘুমন্ত পথটা পড়ে রয়েছে। তার এক দিকে অন্ধকার আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে, আর এক দিকে চাঁদের আলো আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। অদূরে ঘাট দেখা যাচ্ছে। ওইখানে বাসন মাজতে বসে কত দিন ওই গাছগুলোর পানে আনমনে তাকিয়ে থাকতুম। ঘাটের উপরকার বকুল গাছটা আজ আমার মতই রিক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওতে আজ ফুল ধরে নি, কিন্তু কত দিনই ও আমায় কত ফুল উপহার দিয়েছে।

সব গেছে—কিন্তু স্মৃতি তো মন হতে মিলায় নি গো। আজ যাওয়ার বেলায় সব যে একে একে মনে জাগছে। অতি ছোট কথা—ক্ষুদ্র ঘটনাগুলোকেও তো আজ ছোট বলে মনে হচ্ছে না। দীর্ঘ পাঁচটা বছর এখানে কাটিয়েছি, সে তো বড় কম দিন নয়।

নিঃসম্বল হয়ে আসি নি, সম্বল নিয়েই এসেছি। তবু যে কি আশা ছিল বলতে পারি নে। মনে করেছিলুম—হয় তো স্থান পাব,—দাসীর মত এক পাশে পড়ে থাকবার মত এতটুকু স্থান কি আমায় দেবে না? চন্দ্রাও তো স্থান পেত যদি সে আসত। কিন্তু সে আসে নি, কারণ তুমিই বলেছ তার লজ্জা আছে, সঙ্কোচ আছে। সে অভিনেত্রীর জীবন যাপন করে নি, তাই যে গ্রাম সে পেছনে ফেলে গেছে, সে গ্রামে সে আর আসবে না।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—তার আসবার দরকার কি? সে অনেক পেয়েছে। এত বেশী আমি যে আশা করতেও পারি নে। সে তো আমার মত সব দিয়ে কেবল ব্যর্থতাই লাভ করে নি।

ভুল বুঝো না গো,—আমি এখানে অভিনয় করে হাততালি নিতে আসি নি। যশ যথেষ্ট পেয়েছি—গৃহস্থ-ঘরের কল্যাণী বধূরূপে নয়, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীরূপে। কিন্তু কে চেয়েছিল তা? সে দিনগুলো যে আমার জীবনের অভিশাপ, দুঃস্বপ্ন।

সম্বল নিয়ে এসেছি, আমার সামনে শিশিতে রয়েছে। কতটুকু? মাত্র কয়েক বিন্দু। কিন্তু ওতেই আমার জীবন নষ্ট হবে। ওই আমার অসময়ের বন্ধু,—আমায় চিরদিনের জন্যে শান্তি দেবে।

তার পর? তার পর অনন্ত লোকে অনন্ত জ্বালা। আমি মানি—সব মানি—ইহলোক পরলোক, স্বর্গ নরক,—সব। আজ মরণ নিশ্চিত জেনে ভাবছি—ওখানে আমার জন্যে কি শাস্তি তোলা আছে, আমার আমি কি পাব।

জানি—সে জগতেও আমি তোমায় পাব না, সেখানে নন্দা তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে,—আমায় বহু দূরে থাকতে হবে। তবু আমি ছায়ার মত তোমার অনুসরণ করব, আমি তোমায় নিজের করবই। সেদিন নন্দাকে তার সকল দাবী মিটিয়ে নিয়ে সরে যেতে হবে, [illegible] বহুদূরে থাকবে, তুমি সেদিন একান্তভাবে আমারই হবে। এই আশা নিয়ে আমি লক্ষ জন্ম ঘুরব। একটা জন্মে সার্থকতা লাভ করবই, সেই আশায় আমি লক্ষ জন্ম কাটিয়ে দেব।

তোমায় মিনতি করি—আমায় একেবারে মন হতে মুছো না, আমার স্মৃতির সমাধি দিয়ো না। এই ঘরের পানে তাকাতে আমার কথা মনে